Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 2	Place of Publication: Sundaram Prakashani, 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.
Collection: Indrajit Chaudhury, A.B.P. House, Kolkata / Ashok Sen, 98 S. P. Mukherjee Rd.; Kolkata:700028	Publisher: Subho Thakur.
Title: *Sundaram* (Bengali monthly art magazine)	Year of Publication: Year 1, No.1, *Sravana*, 1363 B.S (1956) – Year 4, No. 3 - 12, 1367 B.S. (1960).
	Size (l. x b.): 23c.m. x 17c.m.
Editor: Subho Thakur (03. 01. 1912 – 17. 07. 1985).	Condition: O.K. / Good. Cover page of *Sundaram* 2nd yr, no. 3 is partially torn.
	Remarks: Single volumes with advertisements; Sequence of page numbers may break as cover pages, title pages, content lists are not included in the numbered pages of the book.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

রূপায়ণ

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

সম্পাদক

স্বভো ঠাকুর

লেখক

নীলকণ্ঠ

কানাই সামন্ত

ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়

পঙ্কজ কুমার বন্দোপাধ্যায়

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

জীবেন্দ্র কুমার গুহ

মূল্য

এক টাকা

পঞ্চাশ নয়া পয়সা

কলকাতার বাইরে

ডাক মাশুলের দরুন

এক টাকা

আশি নয়া পয়সা

প্রচ্ছদ-চিত্র : প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি বিচারপতি এ. এন. সেনের সংগ্রহ থেকে

বৈদিক যুগ থেকে

"तंतुं तन्वन्, रजसो भानुमन्विहि,
ज्योतिष्मत:
पथो रक्ष धिया कृतान् ॥
अनुल्बणं वयत,
जोगुवामपो, मनुर्भव, . . ."

ऋग्वेद

সূর্য্যকরের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায় এমন ভাবে সুতো কাটতে হবে, সুতোতে থাকবে না কোন গ্রন্থি। অভিজ্ঞতা সঞ্জাত প্রণালী থেকে বিচ্যুত হ'য়োনা।

কল্পনার দ্বার উন্মুক্ত করে দাও।
বস্ত্রবয়ন, কবিতা রচনারই মতো....

—ঋগ্বেদ

সৌন্দর্য্য থাকে
হাতের তাঁতের বুনানীতেই

অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড
শাহীবাগ হাউস, উইটেট রোড, বোম্বাই।

DA-58/414

সুন্দরম্

আগামী শারদীয় বিশেষ সংখ্যাটি শিল্প-সাহিত্যের একটি অ্যাল্‌বাম্

অপুর্ব অঙ্গ সজ্জা। লাইনোয় ছাপা। অজস্র একরঙা এবং বহু রঙা ছবি। মুদ্রণ-পারিপাট্যে, রচনার শ্রেষ্ঠত্বে এবং অন্যান্য দুস্প্রাপ্য চিত্রের সংযোজনায় শারদীয় 'সুন্দরম্' প্রত্যেক বছরের মতো এবারেও শ্রেষ্ঠ প্রমানিত হবে।

- সাম্প্রতিক কালের বাঙালী-জীবন এবং বাংলার কৃষ্টি সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা এবারকার শারদীয় সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ। শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার কৃত এই নিবন্ধটি এ বছরের অন্যতম বিশিষ্ট রচনা।
- এরপর আছে সুকমল কান্তি ঘোষের একটি ভ্রমণ-কাহিনী। কিছুকাল আগে তিনি জার্মানী ঘুরে এসেছেন। সেই ভ্রমণ-লব্ধ অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় সেখানকার শিল্পকলা-প্রীতিসম্পর্কে তিনি অত্যন্ত মনোরম বাক্‌ভঙ্গীতে পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত কোরেছেন এদেশের শিল্পকলার সমস্যা।
- অধুনা বাংলা নাট্যান্দোলন দেশে এবং বিদেশে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছে। এই নাট্যান্দোলনের যাঁরা নায়ক, কর্মী তরুণ রায় তাঁদের মধ্যে একজন। এবারে সুন্দরম্-এ তিনি তাঁর বক্তব্য প্রবন্ধের মাধ্যমে উপস্থিত কোরেছেন। সন্নিবিষ্ট অনেকগুলি ছবির সংযোজনায় প্রবন্ধটি আকর্ষনীয় হোয়েছে।
- নীলকণ্ঠ বাঙালী পাঠকদের কাছে প্রিয় নাম। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও তিনি লিখ্‌ছেন বিদ্রুপে শানিত, 'পাঠকের দায়িত্ব' নামে তীক্ষ্ণ একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি সকলকে পড়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।
- শ্রদ্ধেয় কানাই সামন্ত মশাই চিত্র সম্পর্কে একটি পাণ্ডিত্যপুর্ণ আলোচনা কোরেছেন। গবেষণানিষ্ঠ এই প্রবন্ধটি চিত্র সম্পর্কীয় আলোচনায় নূতন আলোকপাতে সার্থক। এর সংগে থাকবে অজস্র ছবি।

'সুন্দরম্'-এর পাতায় আরতি ঠাকুর একটি অপরিচিত নাম। 'লুইতর পারে' এই নামে তিনি একটি পুর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছেন। একটি অসমিয়া দুরন্ত শিল্পীর বন্ধন-হীন বিচিত্র জীবনেতিহাসই এই উপন্যাসের উপজীব্য। আসামের রূপ-রস-বর্ণে-গন্ধে উপন্যাসটি পাঠকদের কাছে নুতনতম স্বাদ পরিবেশন করবে।

এছাড়া থাকবে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তক সমালোচনা, লীলা মজুমদারের গল্প, রঘুনাথ গোস্বামীর বোম্বাই এর শিল্পীদের সম্পর্কে আলোচনা এবং আরো একটি নুতন ধরনের ভ্রমণ-কাহিনী।

আর্ট পেপারে ছাপা সুন্দরম-এর শারদ সংখ্যার দাম কোলকাতায় তিন টাকা। কোলকাতার বাইরে তিন টাকা ছাপ্পান্ন নয়া পয়সা। এজেন্টগণ অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

সুন্দরম কার্য্যালয় : এগারো, ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার, কোলকাতা : তেরো।

দুটি বড়ো লাভ

মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপ আমাদের দুটি বড়ো উপকার করবে। অসংখ্য রকমের ওজন ও মাপ যে বিভ্রান্তি ও ক্ষতির কারণ হয়, দেশ, তা থেকে মুক্তি পাবে।

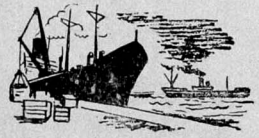

আমরা সেই সঙ্গে পাবো আন্তর্জ্জাতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি পদ্ধতি। সমগ্র বিশ্বে এই মেট্রিক পদ্ধতি স্বীকৃতি পেয়েছে।

এই দুইযুখীন উদ্দেশ্য সফল করার প্রথম ব্যবস্থা হোল মেট্রিক ওজন ব্যবহার করা। বিভিন্ন রাজ্যের নির্ব্বাচিত অঞ্চলে ও শিল্পে ইতিমধ্যেই এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

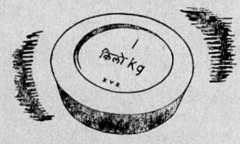

মেট্রিক
পদ্ধতি

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য

DA-58/433 BEN

ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত

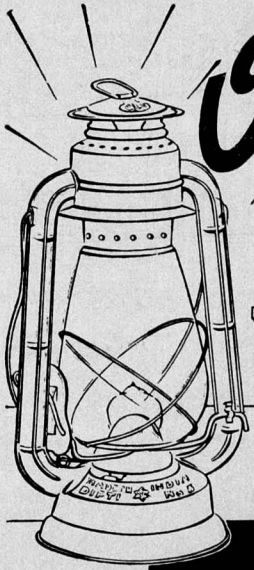

৩টি কারণে

আজ
বেশির ভাগ
লোক কিনছেন

দীপ্তি

কেরোসিন
খরচ কমায়

গভর্ণমেণ্ট প্রশংসাপত্রানুযায়ী প্রতিটী দীপ্তি লণ্ঠন আপনাকে ৬টি বৃটিশ মোম বাতীর সমান আলো দেবে এবং এ আলো ধূম বর্জ্জিত হবে।

কখনও
খারাপ হয় না

গঠনে শক্ত ও
মজবুত
দামে সস্তা

আপনি যখনই কোন লণ্ঠন কিনবেন "দীপ্তি" কিনতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন যে "দীপ্তি" লণ্ঠন কিনলে এর কলকব্জা বিগড়োবার ভয় থাকে না: তাছাড়া নূতন "বারণার" আবিষ্কারের ফলে এর কেরোসিন খরচা ২০ ভাগ কমে গেছে। এর গঠন শুধু মজবুত নয় দেখতেও ভারি সুন্দর। জল ঝড় আর প্রচণ্ড গ্রীষ্ম সবরকম ঋতুতেও এর রং সুন্দর থাকে কারণ খুব ভাল আর দামী রং ব্যবহার করা হয়।

দীপ্তি লণ্ঠন
লক্ষ লক্ষ গৃহ
আলোকিত করে

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড্ অফিস্: ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফ্যাক্টরী: আগড়পাড়া এষ্টেট

Progressive OM.3.Beng

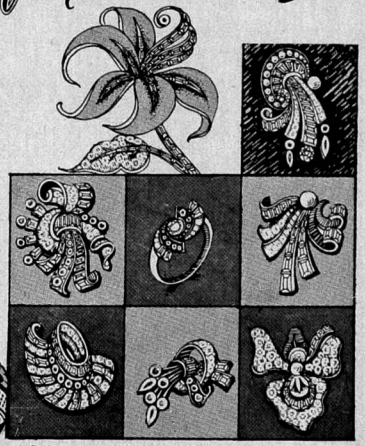

বাংলার কারুশিল্প
বাংলার কারুশিল্প চারুকলার অপূর্ব নিদর্শন। ন্যায়সঙ্গত দর ব'লে তার কদরও হওয়া উচিত ঘরে ঘরে। এসব জিনিস শুধু যে সংগ্রহশালার গৌরব বৃদ্ধি করে তা নয়, গৃহের সৌন্দর্য ও সকলের আনন্দ বর্ধনেও এর তুলনা নেই।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
এম,বি,সরকার এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
ফোন:-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭সি/১. বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস
ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২৯ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬
শোরুমের পুরাতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮এ
B.B.

শ্রীনগরের জন্য

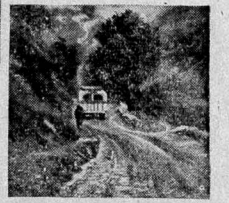

সুবিধা হারে যাতায়াত টিকিট

নিম্নলিখিত ষ্টেশনগুলি থেকে বরাবর শ্রীনগর পর্যন্ত ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর জন্য রেল ও মোটর পথ এবং রেল ও বিমান পথের সংযুক্ত টিকিট এখন সুবিধা হারে পাওয়া যাবে :-

আসানসোল • ভাগলপুর • ধানবাদ • গয়া • হাওড়া
পাটনা জংশন • রাঁচি রোড • শিয়ালদহ

রেল ও বিমান পথের সংযুক্ত টিকিট : ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য একবারের ভাড়ার ১$\frac{১}{৩}$ গুণ এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ১$\frac{১}{২}$ গুণ এবং তার ওপর পাঠানকোট-শ্রীনগর বিমান পথের জন্য আরও ৯০৲ টাকা লাগবে। ৩ বছরের বেশী অথচ ১২ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য এই বিমান পথের ভাড়া হিসেবে ৪৫৲ টাকা নেওয়া হবে; আর ৩ বছরের বা তার কম বয়স্কদের জন্য দিতে হবে ৯৲ টাকা করে।

রেল ও মোটর পথের সংযুক্ত টিকিট : ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য একবারের ভাড়ার ১$\frac{১}{৩}$ গুণ এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ১$\frac{১}{২}$ গুণ এবং তার ওপর পাঠানকোট-শ্রীনগর মোটর পথের জন্য আরও ২৭৲ টাকা লাগবে। ৩ বছরের বেশী অথচ ১২ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের ট্রেনের জন্য অর্ধেক ভাড়া দিতে হবে; কিন্তু মোটর পথের ভাড়া হিসাবে তাদের জন্য দিতে হবে পুরো ভাড়াই, অর্থাৎ ২৭৲ টাকা।

পূর্ব রেলওয়ে

- ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এই টিকিট পাওয়া যাবে
- এই টিকিটের মেয়াদ ৩ মাস
- শুধুমাত্র ফেরার পথে যাত্রা বিরতি করা চলবে—যাওয়ার পথে নয়
- কাশ্মীর প্রবেশের জন্য এখন আর কোন ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না
- সিটি বুকিং অফিসে / এজেন্সীতে এই টিকিট পাওয়া যাবে
- বুকিং অফিস এবং সংশ্লিষ্ট ষ্টেশনগুলিতে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে

ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোং লিঃ

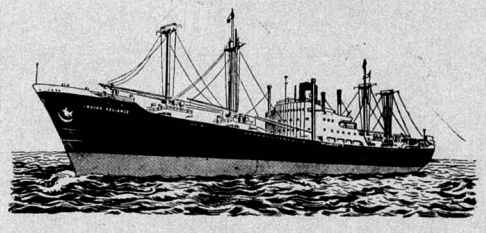

ভারত যুক্তরাজ্য-কণ্টিনেণ্ট সার্ভিস

আমাদের বিদেশগামী জাহাজগুলি ভারতবর্ষ হইতে পোর্ট সুদান, পোর্ট সৈয়দ, লণ্ডন, লিভারপুল, ডাণ্ডী, এণ্টওয়ার্প, রটারডাম, হামবুর্গ, ব্রেমেন ও অপরাপর ইউরোপীয় বন্দরগুলিতে নিয়মিত মাল বহন করে।

ভারতের উপকুল বন্দরেও যাতায়াত করে

আপনার সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়া জাতীয় বাণিজ্য-বহরকে শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

লায়োনেল এডওয়ার্ডস্ (প্রাইভেট) লিঃ

"ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ হাউস"

২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন : ২৩-১১৭১ (৮টি লাইন)

a world
of comfort
in
Dunlopillo

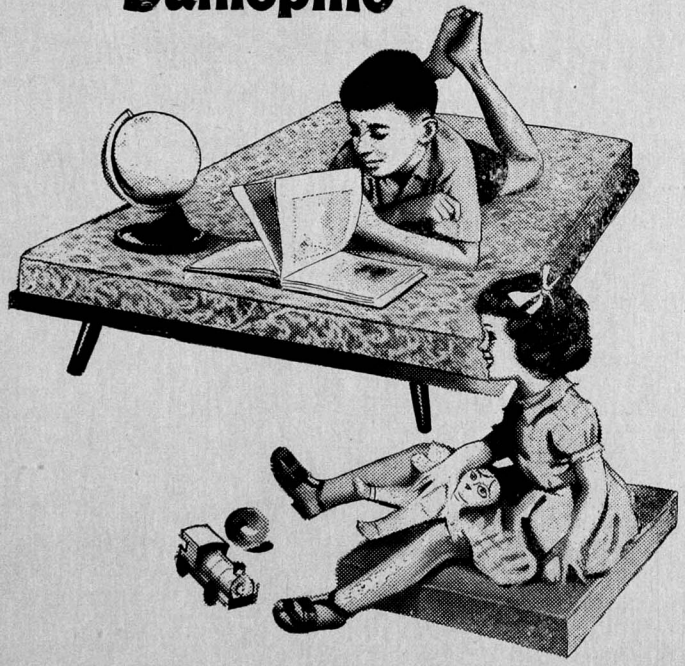

MATTRESSES PILLOWS CUSHIONS

DPC-94

বিশেষ উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করুন

আপনার সন্তানের শিক্ষার জন্য
তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা

অথবা তাঁর বিয়ের জন্য

আপনার বার্দ্ধক্যের প্রয়োজনে

অথবা বাড়ী তৈরীর ব্যবস্থা করতে পারেন,

যদি আপনি নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে কিছু সঞ্চয় করে তা আপনার সরকারের **নতুন**

ক্রমবর্দ্ধমান নির্দ্দিষ্টকালীন জমা পরিকল্পনায় লগ্নি করেন

প্রতি মাসে ▶ ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০ অথবা ২০০ টাকা জমা দিন।

প্রতি মাসে ১০ টাকা জমায় ▶ ৫ বছর পর ৬৫০ টাকা এবং ১০ বছর পর ১৪৫০ টাকা পাবেন।

জমার সীমা ▶ একজনের জন্য ১২০০০ টাকা এবং দুজন প্রাপ্ত-বয়স্কের যুগ্মভাবে ২৪০০০ টাকা।

যদি কোন সময়ে আপনার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট মাসে জমা দেওয়া সম্ভব না হয় ▶ (ক) ৫ বছর ও ১০ বছরের জমায় যথাক্রমে ৫ মাস্ ও ১০ মাস বিরতি রেয়াই যোগ্য, তবে নির্দ্দিষ্ট মেয়াদও সেই অনুযায়ী বেড়ে যাবে।

(খ) নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে আনুপাতিক অর্থ দেওয়া হবে।

আপনার পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক অথবা

জাতীয় সঞ্চয় সংগঠন

আনন্দের সঙ্গেই আপনাকে এই সম্পর্কে অন্যান্য খবর দিয়ে সাহায্য করবে।

DA-58/344 BEN

বাংলা সাহিত্যের ভৌগলিক আঙিনা
আজ ক্রমশঃ বিস্তৃত হোচ্ছে।
প্রসারিত হোচ্ছে জীবন।
আর সেই সংগে নিবিড় হোচ্ছে
মানুষের প্রতি মানুষের
অন্তহীন মমত্ববোধ।

সুভো ঠাকুরের

॥ ব্রহ্মে অব্দি ॥

সপ্তদ্বীপ পরিক্রমার প্রথমখণ্ড

সেই আশ্চর্য
জীবনের সংগে আর
একটি
সার্থক সংযোজন।

নিবিড়তায় যা গম্ভীর, ব্যঞ্জনায় যা গভীর এবং
বর্ণনায় যা মনোরম।

সুন্দর প্রচ্ছদ। পরিচ্ছন্ন ছাপা। যন্ত্রস্থ।

সুপ্রকাশ : নয়, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৬

HANDICRAFTS OF INDIA

(Price per Copy Rs. 5 only)

An invaluable Catalogue of India's famous handicrafts and other useful data, Luxuriously Produced and Profusely illustrated with many colour & block & white photographs.

INDIAN PRINTED TEXTILES

(Price per Copy Rs. 1·25 only)

A study in the art of producing rich, varied and colourful patterns on hand-woven fabrics by India's skilled artisans.

(25% discount in both Publications to recognized booksellers)

For your copy write to :

Publicity Officer

ALL INDIA HANDICRAFTS BOARD
Taj Barracks, New Delhi

DA-58/478

আরতি ঠাকুরের উপন্যাস

ছায়ারঙ্গ

আধুনিক অভিজাত-জীবনের আলেখ্য। দাম ৩৲ টাকা

তরুণ লেখক সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

পারাবত নীড়

এখনকার বিশাল জীবন-মৃত্যু-বোধে চিহ্নিত। দাম ৩৲ টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ-সঙ্কলন

আধুনিক কবিতার ভূমিকা

রবীন্দ্রোত্তর কবিতার ধারা নির্ণয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস

তিন-চরিত্র

বাংলা উপন্যাসে একটি সম্পূর্ণ নূতন আস্বাদ। দাম ৩৲ টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নাটক

মহাকাব্য

শিক্ষিত সমাজের জন্যে 'ড্রইং রুম ড্রামা'। দাম ২৲ টাকা

প্রকাশক : সবিতা প্রকাশ ভবন : ১৭এ, মনোহরপুকুর রোড (ত্রিতল) কলিকাতা ২৬।
বইগুলি সমস্ত সম্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ESTABLISHED 1825

Phone : 44-1444 Grams : 'PAULIN'

WATERPOOFERS OF
CANVAS &
MANUFACTURERS OF
TARPAULINS

F. HARLEY & CO.

5, DEHI SERAMPORE ROAD
CALCUTTA-14

The Statement in compliance with Rule 8 of the Registration of News-papers (Central) Rules, 1956.

about **SUNDARAM**

FORM IV

1. Place of Publication	11, Wellington Square, Calcutta-13
2. Periodicity of its Publication	Monthly
3. Printer's Name	Subho Tagore
Nationality	Indian
Address	
4. Publisher's Name	11, Wellington Square, Calcutta-13
Nationality	Subho Tagore
Address	Indian
5. Editor's Name	
Nationality	11, Wellington Square, Calcutta-13
Address	Subho Tagore
6. Names and addresses of individuals who own the News-Paper and partners or shareholders holding more than one per cent of total Capital	Indian 11, Wellington Square, Calcutta-13 Subho Tagore, Sole Proprietor

I, Subho Tagore, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

SUBHO TAGORE
Signature of Publisher

সূচীপত্র

সুন্দরম্ । তৃতীয় বর্ষ । চতুর্থ-দ্বাদশ সংখ্যা । তেরোশো পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি

সুভো ঠাকুর	সম্পাদকীয়
নীলকণ্ঠ	যবনিকা পতন
কানাই সামন্ত	অবনীন্দ্রনাথ
ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়	টুসু
পঙ্কজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	শান্তিনিকেতনের শিল্পী এ. পেরুমল
শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়	পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্প
জীবেন্দ্র কুমার গুহ	প্রাক্-বৃটিশ ভারতে নগর পরিকল্পনা
নিজস্ব সংগ্রাহক	খবরাখবর

অঙ্গসজ্জা : রণেন আরণ দত্ত

সম্পাদকীয়

সুভো ঠাকুর বলে, সুন্দরের সকল আদর্শ, সকল স্বপ্ন দেশ থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। এ-কদিন খাদ্য আন্দোলনের সূত্রে কোলকাতার যে রূপ প্রকট হোলো—তা ব্রিটিশ আমলে, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনকেও অকুতোভয়ে ছুয়ো দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের অহিংস সরকারের যে মারমুখি হিংস্র মূর্তি দেখা গেলো—তাতে পার্ক ষ্ট্রীট-চৌরঙ্গির মোড়ে গান্ধিজির সার্থক ষ্ট্যাচুর চেহারা, কেন ওমনিতর ভিখিরীর মত, তার এতো দিন বাদে যেন একটা সহজ সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

মানুষের মনে, মহত্বের সিংহাসনে চির-আসীন যে মহারাজা—সেই গান্ধী মহারাজের কিনা ঐরকম ভিখিরীর রূপ!...সেদিন ওর মন অহেতুক স্বনামধন্য সেই শিল্পীর অক্ষমতাকে বারম্বার ধিক্কার দিয়েছিলো—না বুঝে। আজ জলের মত পরিস্কার হোয়ে গেলো, এই মূর্তির মাধ্যমে অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন শিল্পীর ইঙ্গিতময় আদত উদ্দেশ্য।

একদা দেশের জনক গান্ধী, গড্‌সের হাতে নিহত হন—সত্যি। কিন্তু এখন মনে হয়, গড্‌সের হাতে তিনি একবারই মাত্র মরেছেন এবং তিনি মরেই একমাত্র

রেহাই পেয়েছেন। তা না হোলে অহিংসা পরমধর্মে বিশ্বাসি প্রত্যেকটি গদিতে-আসীন বুদ্ধদেব রূপ গড্‌সের হাতে তাঁর উপর নিত্য গুম্‌খুনের যে হাম্‌লা চোলতো, তা যে চাক্ষুষ কোরতে হয়নি—এইতো পরম সৌভাগ্য!

এখন দেখা যায়—দেশের দুঃশাসনদের হাত থেকে গান্ধিজির আদর্শকে বাঁচাবার জন্যই যেন গড্‌সের আবির্ভাব! তাইতো যাবৎজীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে গান্ধী মেমোরিয়াল ফাণ্ড থেকে যাবৎজীবন পেন্‌সেন রূপ পুরস্কারের দাবী রাখে সে।

হায় গান্ধী! জাতির জনক হিসাবে আর কিছুদিন বাঁচলে তোমার যে কি হাল হোতো, তা মানস চক্ষে সুভো ঠাকুর অবলোকন কোরে ক্ষণে ক্ষণে আতঙ্কে আঁতকে উঠতে বাধ্য হোচ্ছে।

* * *

সেদিন সহর কোলকাতার বুকের উপর যে ঘটনা ঘটলো, তা দেখে ওর কাছে স্বতই মনে হোয়েছে—এবারো বুঝি গণ-অভ্যুত্থানের আদ্যপীঠ এই বাংলা দেশেই রচনা হোতে চল্‌লো।...গুলী আর ইঁটের পালটা-পালটি জবাব। পটকা আর হাতবোমার আচম্‌কা বিস্ফোরণ। গুজবের গম্‌গুজ আকাশ ছোঁয় আর কি! এর উপর আবার পুলিশের গুলিতে হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত এবং উত্তেজিত আলোচনা। রাস্তায় মাঝে মাঝে ডাইবিন্ উল্টে এবং ঠ্যালাগাড়ি পার্শ্বে পথরোধের নানা উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা। এরই মাঝে, মোড়ে মোড়ে বৃদ্ধ-তরুণ এবং কিশোরদের জটলা। আলোচনা র একমাত্র বিষয়বস্তু—এইরূপ অক্ষম, অপদার্থ, উদ্ধত উপরওয়ালাদের নিপাত নিঃসন্দেহে কি কোরে আনা যায়।

সুভো ঠাকুর বলে—ওই সব আলোচনাকারীদের মধ্যে কারুর চেহারাই কিন্তু তথা কথিত 'র‍্যাল্টি সোসাল' কিম্বা গুণ্ডার মতো মনে হয়নি। আর গুণ্ডা যদি কেউ তাদের মধ্যে থেকেই থাকে, তবে উপরওলাদের ইলেক্‌শন-এর কৃপায় তারা তো ভদ্রলোকের বাড়া। তারা আজ শুধু মাত্র পাড়ার মাতব্বরই নয়—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, পুলিশের পিতৃব্যতুল্য বিরাজমান। আজ অক্ষম পুলিশ, পাড়ার শান্তি রক্ষার জন্য তাদেরই দরবারে দরবারী।

হাঙ্গামার দিনে হঠাৎ-পরিচিত সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক-টির প্রস্তাব, মনে পোড়ে যায় সুভো ঠাকুরের। —বীর হনুমানের দেশ মহান এই ভারতভূমি! এখানে বীরের অভাব কি? বীরেরা এখানে ছড়িয়ে আছে ওয়েলিংটনের আশে পাশে, অলিতে-গলিতে, লালবাজারের আর লাল দিঘীর আনাচে কানাচে। জেনারেল থিমায়ার রেজিগ্‌-নেশন র‍্যাক্‌সেপ্‌ট করা উচিত ছিলো নেহেরুর। কোলকাতার লালদিঘী অঞ্চলে—লালবাড়ীর উপরে অবস্থিত এই দাহিত-মুখ লাঞ্ছুলহীন বীর পুঙ্গবদের মধ্যে থেকে মাত্র দুটিকে পাঠালেই তো যথেষ্ট—ভারতের সীমান্ত রক্ষার সব সমস্যার সমাধান হোয়ে যায়।

* * *

উপরওয়ালাদের স্বৈরাচারের ফলস্বরূপ · াভাবে পীড়িত অস্থিচর্মসার গ্রাম হোতে আগত নিরীহ নর-নারীর উপর বেপরোয়া লাঠিবাজির যে নিদারুণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা এবং এ-কয়দিন নিরস্ত্র পথচারী থেকে ছাত্রদের উপর যেরকম বেপরোয়া গুলী চালনায় চতুর হাতের কারসাজি দেখিয়েছেন তাঁরা—তাতে দেশকে পররাজ্যের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে নেহেরুজীর এইরূপ নিশ্চিন্ততার একটি সুনিশ্চিত হদিস খুঁজে পাওয়া মোটেই আশ্চর্য্যের নয়।

মহাকালের কালিতে যে নূতন লেখার মক্কো পশ্চিম-বঙ্গের বুকের উপর লেখা হোতে চোলেছে তাতে পুনশ্চ মালুম হয়—বাংলা আজ যা করে—সামনের কাল সারা ভারতে তা হবার প্রস্তুতি চলে।

মানুষের অন্ননস্ত্রের চাহিদা সর্বপ্রথম মেটা আবশ্যক। এই আবশ্যকতা সভ্য দেশে অবশ্য পুরণ হওয়া উচিৎ। অপরাগ হোলে অসভ্য সারমেয়ীর ন্যায় গদীয়ানদের গদী কামড়ে না-পোড়ে থাকাই ন্যায় সঙ্গত—গদী তো আর কারো পৈত্রিক অর্জিত সম্পত্তি নয়। আর এতেও যদি অপদার্থদের হুঁস্ না হয়, তবে এনন কি পৈত্রিক অর্জিত সম্পত্তি—জমিদারীও যেমন এদেশের জমিদার কুল সসম্মানে ছাড়তে বাধ্য হোয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছেন; এঁরাও তেমনি, আজ বাদে কাল পথপ্রান্তে এসে দাঁড়াতে বাধ্য। তফাতের মধ্যে—কেবলমাত্র অ-সম্মানের মোট

মাথায় লোকের নিন্দা ও নিষ্ঠিবনে অবগাহন—এই ভবিষ্যদ্বাণী এঁদের ললাটে।

শিল্পী সাহিত্যিকরা ভবিষ্যদ্দর্শী—তাই কালের লিখন পোড়তে সহজেই তারা পারঙ্গম—এই কারনেই শ্রদ্ধেয় নলিনী সরকারের পর বাংলাদেশে যে সব উপরওয়ালারা আজও তাঁদের মর্মর মূর্তি তৈরী করেননি—তাঁরা এই জীবদ্দশায়—আসনে থাকাকালীন অবস্থায়, অবিলম্বে যেন স্ব স্ব ষ্ট্যাচুর অর্ডার দেন। সুন্দরম্ এ-ব্যাপারে এই কারণে অতিরিক্ত উৎসাহী, যে তাতে অন্ততঃ দরিদ্র ভাস্করকুল দু-পয়সা পেতে পারে।

সুভো ঠাকুরের এইরূপ শিল্পবিহীন সম্পাদকীয়ের জন্য সুভোঠাকুর মার্জনা যাচিঞা কোরে সমাপ্তি টানে যে, শিল্পীরা আজ সমাজ সচেতন জীব, হাতীর দাঁতের মিনারের চূড়ায় বোসে গোঁফে চাড়া মারতে নেহাতই নারাজ। চতুপার্শ্বে যা ঘোটছে—তাতে শিল্পীদের এই কথাই মনে হয় যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তুলি ছেড়ে তাদেরও তলোয়ার ধরার দিন আগত।

সুন্দরম্ এই সংখ্যার সঙ্গে তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ কোরলো। আগামী সংখ্যা তথা সামনের শরৎ সংখ্যায় সুন্দরম্ চার বছরে পদার্পন কোরবে। সেই কারণে সুন্দরম্-এর আগামী শরৎ সংখ্যা কেবলমাত্র শরৎ সংখ্যাই নয়, বার্ষিক সংখ্যাও বটে।

সুভো ঠাকুর অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাসী। সেই কারণে বাজারে, সিনেমা-সাহিত্য পত্রিকার 'থান্ ইষ্টক' পর্বের পালা সমাপণ হোলে শরৎ সংখ্যা সুন্দরম্ আত্মপ্রকাশ কোরবে। সাহিত্য এবং সুন্দর-এর পবিত্রতা বজায় রাখার দরুন আমাদের এই ইচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম। আশা করি ধীমান পাঠকেরা আমাদের সঙ্গে সহযোগীতা কোরবেন। সুঃ সঃ

যবনিকা পতন

নীলকণ্ঠ

তারুণ্যেই যাঁরা উজ্জ্বল রচনাবৈশিষ্ট্যের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন কোরেছেন নীলকণ্ঠ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।
বিদ্রূপ ও শ্লেষের তীক্ষ্ণতায়, পাঠকচিত্তকে আচ্ছন্ন করবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর।

'ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা,
—রাত্রি বেলা।'

সূর্যদেব অস্তাচলে গেলেন।

সুরু হয়ে যাবে এখন রাত্রির অন্ধকারে পেঁচকদের দিন। আলমগীর ও রঘুবীর, জীবানন্দ ও রাসবিহারীকে দেখা যাবে না আর; অথবা শ্রীমধুসূদনকে আর কোনও দিন শোনা যাবে না আবৃত্তি করতে: টু-মরো এণ্ড টু-মরো এণ্ড টু-মরো! তার বদলে এখন রঙ্গমঞ্চে যা হবে—তা পুতুলখেলা।

হটাৎ কোনও চুক্তির ফলে তাজমহলকে যদি তুলে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় আগ্রার মাটি থেকে কোনও এক ভয়াবহ ভবিষ্যতে, তাহলে উত্তরকালের সর্বজ্ঞ—যারা, দুহাত তুলে ঊর্দ্ধবাহু হোয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল অবলোকন কোরে সপ্তমাশ্চর্য প্রত্যক্ষ কোরেছে বলে—কেবল তাদেরই সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব, দক্ষের অনুপস্থিতিতে নাট্যোৎসবের দক্ষযজ্ঞে এখন থেকে যাদের উপস্থিত থাকবার দুর্ভাগ্য হবে, কেবল মাত্র তাদেরই।

শিশিরকুমার ফিরে গেলেন যেখান থেকে এসেছিলেন তিনি। নটরাজের বিরামহীন নৃত্যের তালে কালের মন্দিরা যেখানে অবিরাম বাজে, বাজে ফুলে, বাজে কাঁটায়; আলো ছায়ার জোয়ার ভাঁটায়। বাজে দুঃখে সুখে শঙ্কাতে। কালের মঞ্চ থেকে মহাকালের রঙ্গমঞ্চে প্রস্থান করলেন; নটরাজের কাছে ফিরে গেলেন রাজনট। ভালোই হোলো। শিশিরকুমারের মহাপ্রস্থানে যারা বিষণ্ণবিধুর আমি তাদের একজন নই। কারণ আমি জানি, আমি জানি—যে, যেসময়ে তিনি পাদ-প্রদীপের সামনে এসেছিলেন, সেসময় তাঁর আসা কোনও দৈব অনুগ্রহে ঘটেনি। ইতিহাসের নির্দেশেই তা সম্ভব হোয়েছিলো। জীবনের কুরুক্ষেত্রে বাঙালীর সেদিন জয়জয়কার। শিক্ষা, বিদ্যা, সংস্কৃতি, সমাজ, রাজনীতি জীবনের এমন কোনও ক্ষেত্র ছিল না যেখানে না পদক্ষেপ কোরেছিলো বঙ্গসন্তান। শুধু পদক্ষেপ নয়, এগিয়ে গিয়েছিলো নারায়ণী সেনা! ইতিহাসসম্মত ছিলো সেই বাঙালীর নবযুগ। ইতিহাস বলে—যুগের প্রয়োজনেই আবির্ভাব ঘটে নবযুগের। সেদিন বাঙলা দেশের দিকে দিকে দেখা দিয়েছিলেন যে দিক্‌পালরা তার শেষ স্বীকৃত উত্তরাধিকারী হোলেন শিশিরকুমার। —তাঁরা যে একসঙ্গে একদেশে এককালে দেখা দিয়েছিলেন একাদিক্রমে, একে কয়েন্‌সিডেন্স বলা—অবৈজ্ঞানিক উক্তির নামান্তর মাত্র। একে যদি অঘটন বলি, তাহলে এঘটন ঘটানোও কেবল তারই কাজ, যার নাম—সব দেশে সব কালে অঘটনঘটন পটিয়সী ইতিহাস।

ইতিহাসসম্মত যদি হোয়ে থাকে সেদিন বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শিশিকুমারের আবির্ভাব—তাহোলে আজ ভগ্ন মঞ্চরঙ্গ থেকে নাট্যাচার্যের মহাপ্রস্থানও ইতিহাস অনুমোদিত।

বঙ্কিমারের ভূমিকায় শিশিরকুমার।

সেদিন শুধু বঙ্গদেশ নয়, দেশে দেশে নানা বেশে দেখা দিয়েছিলেন জীবনশিল্পীরা। রেণেসাঁর গর্ভ থেকে যুগন্ধরেরা পৃথিবীর সকল প্রান্তে ভূমিষ্ঠ হোয়েছিলেন একের পর এক! আর আজ ঠিক একই রকমভাবে জীবনের নাট্যশালা থেকে বিদায় নিচ্ছেন রাজা, রাজমন্ত্রী, সেনাপতি, বিদূষক সবাই; একের পর এক 'নিভিচ্ছে দেউটি।' সেদিন পুরাতন পৃথিবীর কানে নতুন জীবনের বাণী বহন কোরে এনেছিলেন যাঁরা, তাঁরা প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় পুরুষ। তাঁদের শেষ বংশধররাও বিলুপ্ত হোয়ে এলেন আজ। যে দু-একটি শিবরাত্রির সল্‌তে এখনও জ্বলছে, এখানে আর ওখানে, তাদের উদ্দেশেই কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে এই বাণী:

'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দমন্থরে,
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ বন্ধ কোরনা পাখা!'

বিলুপ্তি আসন্ন মানবসভ্যতার, সেই অন্তিম সন্ধ্যায় মিলিয়ে গেলো সূর্যাংশের শেষ শুভ্র শিখা। অর্ধশতাব্দীকাল আগে, পূর্ব দিগন্তে সপ্তাশ্বে আরূঢ় হোয়েছিলেন যিনি নটদেউলের অন্ধকারে বিকীরণ কোরতে প্রতিভার সপ্তরশ্মি, সেদিন তাঁকে আবাহন কোরেছিলাম যে মন্ত্র উচ্চারণ কোরে, মহাপ্রস্থানের মুহূর্তেও প্রণাম করব তারই পুনরাবৃত্তি দ্বারা: ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্!
ধান্তারিং সর্বপাপোঘং প্রণতোস্মি দিবাকরম্॥

দুই

রঙ্গমঞ্চের ওপর আজীবন যত নাটকে তিনি নেমেছেন, সেই সমস্ত নাটকের চেয়ে অনেক বৈচিত্রের, অনেক কৌতূহলের, অনেক উত্তেজনার ছিলো তাঁর নিজের জীবন-নাট্য। যত ভূমিকায় তাঁকে আজ পর্যন্ত দেখা গেছে, তার মধ্যে জীবনের রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ভূমিকাতেই তাঁকে মানিয়েছে সব চেয়ে বেশি। মধুসূদন যেমন তাঁর সৃষ্টির চেয়ে অনেক সুদূরপ্রসারী ছিলেন, শিশিরকুমারকেও তেমনই অভিনয়ের জীবন থেকে জীবনের অভিনয়ে আমরা দেখেছি অনেক বেশি উন্মুক্তবরাবরী! খাপখোলা-ধারালো তলোয়ার যেমন ঝল্‌সে ওঠে সূর্যালোকে, তেমনি জ্বলে উঠতে দেখেছি আমরা শিশিরকুমারকে বারবার—জীবনসন্ধ্যায় দেখেছি শেষবারের মতো। জীবনের প্রথম প্রভাতে যেমন, তেমনই জীবনের সায়াহ্নে শুনেছি তাঁকে আবৃত্তি কোরতে: ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা—রাত্রিবেলা! এ আবৃত্তি তাঁর মুখেই মানাতো, নিজের জীবন নিয়ে যিনি আজীবন কোরেছিলেন রঙ্গ—রঙ্গমঞ্চের ওপর জীবনে যত চরিত্রকেই তিনি জীবন দিয়ে থাকুন, সবার উপরে, সব চেয়ে বড়ো, সব চেয়ে সত্য ছিলো তাঁর নিজের জীবনরঙ্গ!

মাইকেলের জীবনীকাররা মাইকেলকে বুঝতে পারেন নি। না পারারই কথা। সূর্যকে বুঝতে হোলে সূর্য হোতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব কোরতে পার্থ হোলেই চলে না, পার্থসারথি হওয়ার হয় প্রয়োজন। মাইকেল যদি মিতব্যয়ী হোতেন, মদ না খেতেন, বিধর্মী না হোতেন, বিষয়-আসয় কোরে গুছিয়ে নিয়ে তারপর লিখতে বসতেন—কি হোতো তাহলে? নির্বোধ জীবনীকারদের কথা মেনে নিয়ে দস্তোকুলোদ্ভব কবি কলম নিয়ে বোসলে, মেঘনাদবধ বেরুতো না সে লেখনী থেকে; যা বেরুতো তার নাম সম্ভাবশতক। তার জন্যে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এর মতো যথেষ্টরও বেশি কলম—মাইকেলের আগে, তাঁর সময়ে, তাঁর পরে এবং আগামী কালেও থাকবে।

মাইকেলের জীবনীকাররা বোলে থাকেন—মাইকেলের আশার ছলনে ভুলি পংক্তিটি উদ্ধার কোরে—যে, তিনি নিজেও বুঝি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। না। পারেন নি। যদি এই কবিতা লেখবার পর তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া যেত তাঁর যৌবন তাহলে তিনি পুনরায় অমিতব্যয়ী হোতেন, মদ খেতেন, বিধর্মী হোতেন। অতঃপর জীবনের শেষে আবার আর্তনাদ কোরতেন পুনরাবৃত্তির সুরে—আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়! যে মাইকেল: 'আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে' লিখেছিলেন, তাঁর হাত দিয়ে আত্মবিলাপ শ্রুত হয় যখন, তখন বোঝা যায় সে কান্নাও তাঁর কাছে কবিতা ছাড়া আর কিছু হোয়ে দেখা দেয়নি কখনও!

শিশিরকুমার ভাদুড়ী যদি অধ্যাপনা ত্যাগ কোরে নটনাথের দীক্ষা না গ্রহণ কোরতেন, তাহলে তিনি আর যাই হোন, তিনি কিছুতেই তা হোতে পারতেন না—তিনি যা হোয়েছেন। আর একজন অধ্যাপক বাড়তো অধ্যাপক-দের বহুবিস্তৃত তালিকায়। অনেকজনদের মধ্যে আর একজন মাত্র হোতেন তিনি—যে একজনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত আমরা পেলাম অনেকজনকে। অধ্যাপনার পথে থাকলেও তিনি কীর্তিমান একজন অধ্যাপকই হোতেন। ব্যারিষ্টার হোয়ে থাকলে—যেমন চিত্তরঞ্জন সি. আর. দাশ হোয়েই রইতেন, দেশবন্ধু হোতেন না কোনো দিনও। অধ্যাপক, কীর্তিমান অধ্যাপক হোলেও, প্রোফেসর ভাদুড়ী বই আর কি হোতেন তিনি? কিন্তু সেকথাও নয়। নিশ্চিন্ততার নিরাপদ বন্দর ত্যাগ কোরে সমাজের সম্মান-জনক উঁচু তলা থেকে তিনি কেন নেমে এলেন নীচে? অসম্মানের আর সামাজিক অবমাননার অতল পঙ্কে কেন ডুব দিলেন শিশিরকুমার? জানি! বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারেরা বোলবেন ছেলে বয়স থেকেই নট হবার ঐকান্তিক বাসনাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলো নটনাথের মন্দিরে। না। এ ব্যাখ্যা স্কুল পাঠ্য কেতাবে লেখা যায়; জীবনের কেতাবে যায় না। শিশিরকুমার যত বড় শিল্পীই হন, এতদূর বাস্তবজ্ঞান বিবর্জিত কোনও দিনই ছিলেন না সেদিন, সেইকালে, যেকালে নটের জীবন নটীর জীবনের চেয়ে বেশি সম্মানের ছিল না। তাঁর এ ধারণার কোনও সঙ্গত কারণ ছিলো ভাববার—যে, অধ্যাপনার চেয়ে নটের জীবন অনেক কুসুমাস্তীর্ণ? এ ধারণাও তাঁর না থাকবার কোনও কারণ কোনও কালেই কথা নয়—যে, বাঁচবার জন্যে অর্থের প্রয়োজন, আর অর্থই সামর্থ্য। এবং সংসারের সার হচ্ছে স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করা; সন্তানের শিক্ষা সম্পূর্ণ এবং বার্ধক্যের জন্যে সঞ্চয় করা। অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকলে তাঁকে কোনও দিনই এসবের জন্যে ভাবতে হোতো না। তবুও কেন সব ত্যাগ কোরে সেদিনকার সমাজের চোখে যারা (যাত্রার) সং তাদের জাতে তুলতে নিজেকে নিমজ্জিত কোরলেন অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের চোরাবালিতে। যদি এ প্রশ্ন শিশিরকুমারকে করা যেতো, তাহলে তাঁর পক্ষে নিরুত্তর থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর কি ছিলো? অথবা সকল কালেই এর উত্তরে শিল্পীরা যা বোলে এসেছেন বরাবর: আই হ্যাভ্ টু গো থ্রু—তার পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া। সব লোক যা পারে সবাই তা পারে না। সমাজ সংসার যার কাছে মিছে নয়, সে নয় শিল্পী। আর যে শিল্পী, সে সবাই যা পারে—তা পারে না, পারে না বলেই সে শিল্পী। নীর ত্যাগ কোরে শুধু ক্ষীরেই যার আসক্তি সে আর্টিশান্! ক্ষীর ত্যাগ কোরে নীর নিয়ে যার অকারণ কেলী সেই শুধু আর্টিষ্ট!

চেষ্টা কোরলে মিস্ত্রী হওয়া যায়, শিল্পী নয়। শুধু শ্রম থেকে শিল্পীর জন্ম অসম্ভব। প্রতিভা ব্যতিরেকে কেবল শ্রম সম্বল কোরে শিল্পী হওয়া সম্ভব নয়। প্রতিভাবঞ্চিত শিল্পীর শ্রম—পরিশ্রম নয়, পণ্ডশ্রম। এই প্রতিভার কোনও সংজ্ঞা নেই। কোকিল কেন ডাকলেই পঞ্চমে ডাকে, কেউ কেউ কেন কলম ধরলেই ব্রাদার্স কারামাজোভ সৃষ্টি করে, একথার জবাব একমাত্র সেই দিতে পারে যে পঙ্গুকে দিয়ে মুহূর্তে লঙ্ঘন করায় পর্বত; এবং বাক্‌রহিতকে করে বাগ্মী। দেশে দেশে কালে কালে তার নাম যাই হোক, তার আসল নাম, আদি এবং অকৃত্রিম নাম: ইতিহাস। এই ইতিহাসই যখন যাকে যেখানে প্রয়োজন সেইখানে পৌঁছে দেয়। রাজমিস্ত্রীকে সে হাত ধোরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয় রাজতক্তে; ফাঁসির মঞ্চ থেকে মুক্ত কোরে এনে কাউকে করে যোগী—তার মুখ দিয়ে শোনায় জীবনের জয়গান! মুচির ছেলেকে দিয়ে সেই করায় সাম্যের চণ্ডীপাঠ। সেই অপ্রতিহত, দুর্বার ইতিহাসের নির্মম নিয়তিই 'প্রথিবি' বানানকারকে দিয়ে উপহার দেয় একদিন প্রথম বাঙলা মহাকাব্য, বুকে বয়ে বয়ে শিল্পী হবার জন্যেই যার জন্ম—তাকে, টেনে নিয়ে যায় অনিশ্চিতের অতল পঙ্কে। নিয়ে যায় তার কারণ ইতিহাস জানে মিডিওকার জমিতে সব্‌জি হয় শুধু, আর পঙ্কের ডাক পড়ে পঙ্কজের প্রয়োজনে। শিশিরকুমার সেই ইতিহাসচিহ্নিত পুরুষ। স্বেচ্ছায় যান নি তিনি অধ্যাপনার আসন ত্যাগ কোরে অভিনয়ের আসরে অবতীর্ণ হোতে। ইতিহাস তাঁর হাত ধোরে নিয়ে গিয়েছিলো অধ্যাপনার আলোর নীচে সেদিনকার অভিনয় জগতের অনেকখানি অন্ধকারময় আবহাওয়ার মধ্যে—একটুখানি আলোর কারণে। তাই বলি—শিল্পী হওয়াই ছিলো শিশিরকুমারের নির্মম নিয়তি। এই নিয়তির দৌলতে

একদা সবকিছু ফেলে গর্গাকে দৌড়তে হোয়েছিলো তাহিতি দ্বীপে। এই নিয়তির দৌলতেই বীরভূমের তেপান্তরের মাঠের মধ্যে রচিত হোলো বিশ্বের বরেণ্য বিশ্ববিদ্যালয় 'বিশ্বভারতী'। এই নিয়তির আরেক নাম আমরা নিয়তই বিস্মৃত : ইতিহাস।

কিন্তু পদ্মের গায়ে কেন পাঁকের স্পর্শ; কয়লার কালোয় কেন হীরকের দ্যুতি—এ কেবল প্রশ্নই করা যায়—ইতিহাসও এর জবাবে নিরুত্তর। মধুসূদন কেন মিতব্যয়ী হোতে পারেন না—শিশিরকুমার কেন স্বীকার কোরতে পারেন নি শৃঙ্খলাকে—এই 'কেন' না তুলে মেনে নিতে হয়—এমনই হয় বোলে। গতানুগতিকতার শৃঙ্খল মুক্ত কোরতে আসেন যাঁরা সমাজের শৃঙ্খলাকেও তাঁরা অস্বীকার করেন। জানি। জানি যে এরও ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু সেই ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ তো নিয়মেরই প্রমাণ; তাই তাঁর কথা থাক। প্রকৃতির নিয়মেই যেমন পদ্মের অঙ্গে পাঁক, তেমনই স্বভাবের নিয়মেই প্রতিভার সর্বাঙ্গে অসামাজিক সাজ। প্রতিভা বোলে যাকে আমরা স্বীকার করি সে আমাদের শিকার করে। যে গরু দুধ দেয় তার শিঙ নাড়ার অধিকার সর্ববাদী সম্মত। মিডিওকার নয় বোলেই, যে প্রতিভা সে কেন মিডিওকার সমাজের অনুশাসন মানবে? শিল্পীকে শিল্পীও করো আবার স্বাভাবিকও করো—স্রষ্টার কাছে এমন বর যে চায়—সে শিল্পরসিক নয়, সে নিতান্তই বর্বর। কারণ, আমি ডুডুও খাবো, টামুকও খাবো—এ নাটকের সংলাপ হোতে পারে, জীবনের সংলাপ নয়, কখনই নয়।

তিন

দাতব্য চিকিৎসালয়ে মধুসূদনের মহাপ্রয়াণে যাঁরা আজও ম্লান, তাঁরা মহৎ শিল্পীর বেদনা কি তা অনুভব কোরতে অসমর্থ! কুবেরের ঐশ্বর্য হাতে পেলেও মধুসূদনের হাতে তা কর্পূর হোয়ে উবে যেতে যত সময় নেয় তার চেয়েও কম সময় নিতো নিঃস্ব হোতে। মহাকবির মুখে যতবারই উচ্চারিত হোক না কেন সাংসারিক দুঃখের বিষন্ন মধুর বাণী—আসল দুঃখ মহাকবির অনেক বেশি সৃষ্টির বেদনা থেকে উৎসারিত। সংসারের জ্বালা নয়; সৃষ্টির অন্তর্জ্বালাই মহৎ শিল্পীর ইতিহাস। মধুসূদন যে আর লেখবার সুযোগ পেলেন না, আমার কাছে এই দুঃখই দুঃখ। মধুসূদনের সাহিত্য-গবেষক যেসব বিশেষ অজ্ঞ অধ্যাপকরা অধুনা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা কোরে থাকেন, তাঁরা এই সত্য প্রায় বিস্মৃত—যে, মহাকবি মাত্র সাড়ে তিন বৎসর সময় বঙ্গভাষায় সাহিত্যচর্চা করেন। সেই স্বল্পসময়ের মধ্যে যে অত্যুৎকৃষ্ট ফসল, বন্ধ্যা বাঙ্গলা-ভাষার জমিতে ফলান—তার বহু বিশ্রুত নাম : 'মেঘনাদবধ', 'তিলোত্তমা সম্ভব', 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'। 'কৃষ্ণকুমারী', প্রথম বাঙলা ট্রাজেডির জন্মও ওরই মধ্যে। এছাড়া অনুবাদ ও অসম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ আরও কিছু রচনার আবির্ভাব সাড়ে তিন বৎসর সময়ের মধ্যেই। 'সম্মুখ সমরে পড়ি' থেকে সুরু কোরে মহাকাব্যের খেয়াল থেকে গীতিকাব্যের গজলেরও সূচনা করে যান তিনিই; 'আশার ছলনে ভুলি' অথবা 'রেখ মা দাসেরে মনেতে আধুনিক বাঙলা গীতিকাব্যের পূর্বাভাস।' হাতে আরো সময় পেলে, সেই হাত দিয়েই বেরুতো এই কয় পংক্তি যা পরবর্তী কালে বিশ্বকবির কণ্ঠে শ্রুত হোলো : "আমি নামবো মহাকাব্য সংরচনে ছিলো মনে; লাগল কখন্ তোমার কাঁকন কিঙ্কীনিতে, কল্পনাটি গেলো ফাটি হাজার গীতে।" সেই সহস্র সঙ্গীত রচনা সম্পূর্ণ হোলো না আর এজীবনে, এই বেদনা কেবল মহাকবিরই যোগ্য।

মধুসূদনের মহাকাব্য অপেক্ষা তাঁর জীবনমহাকাব্য নিয়েই বঙ্গবাসীর অধুনা উচ্ছ্বাস অনেক বেশি। মধুসূদনের মহাকাব্যের অংশবিশেষে কলেজ-পাঠ্য কেতাবের অঙ্গীভূত মাত্র। এই কারণেই মধুসূদনের নাম আজও উচ্চারিত। নাহলে, সেক্সপীয়রের ক্ষেত্রে যেমন ওই এক লাইন : টু-মরো! এণ্ড টু-মরো! এণ্ড টু-মরোর পর্যন্তই এযুগের বেশির ভাগ মোল্লার দৌড়; গীতা বোললেই ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে পর্যন্ত এগিয়েই যেমন চোঁক গেলা; মধুসূদনের সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় তেমনই—'আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে', এই এক পংক্তিতেই এযুগের সাহিত্য-পাঠকের ডায়রী সমাপ্ত। সমাপ্ত বোলেই এ যুগের সাহিত্য-আলোচনায় : ভাবের চেয়ে অভাবটাই বেশি। অভাবটাই বড়। ভাবের অভাবে অভাবটাকেই দেয়া হয় প্রাধান্য। পৃথিবীতে এমন লোক

আছেন যাঁদের জীবন তাঁদের কীর্তির চেয়ে মহৎ, কিন্তু বঙ্গদেশে এমন দুজন শিল্পী সেকালে এবং একালে এসেছেন এবং গেছেন যাঁদের জীবনের চেয়ে যাঁদের কীর্তি অনেক বৃহৎ। সেই দুজন হোলেন যথাক্রমে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ী। দুজনের আবির্ভাব-সময়ের মধ্যে যোজন ব্যবধান; কিন্তু দুজনের তিরোধানের সাল আলাদা হলেও তারিখ এক : ২৯শে জুন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী জীবনের সায়াহ্নে শ্রীরঙ্গমের ক্রোড়চ্যুত হোয়ে শহর থেকে শহরতলীতে নির্বাসন উদ্‌যাপন কোরছিলেন যখন, তাঁকে দেখে আমার মনে যাঁর স্মৃতি অবশ্যম্ভাবীভাবে উজ্জ্বল হোয়েছিলো তিনি ইতিহাসের পাতা থেকে সেদিন উঠে এসেছিলেন মুহূর্তের জন্যে : সেণ্ট হেলেনায় নির্বাসিত অবিস্মরণীয় : নেপোলিয়ান। পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দুলকে—তুলনায় অনেক নিরীহ না মনে কোরে পারিনি সেদিন। নেপোলিয়নকে নির্বাসন না দিয়ে যদি বিজয়ীর কৃপা প্রদর্শনের কারণে করুণার জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হোতো তাহলে সে প্রহসন জমতো শিশিরকুমারকে সাহায্য দেবার নামে রিলিফ ফাণ্ড খুললে।

শিশিরকুমারকে দিয়ে ইতিহাসের প্রয়োজন ফুরিয়েছিলো। গিরিশচন্দ্রে যাঁর সূচনা, শিশিরকুমারে তাঁর যথার্থ উপসংহার। নাট্যলোকের এক স্বর্ণসিংহদ্বার হোলেন প্রফুল্লর রচয়িতা : আরেক স্বর্ণসিংহদ্বার হোলেন যোগেশের স্রষ্টা। শিশিরকুমারকে যাঁরা মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ জানাতেন সৌখীন অভিনয়ের আসরে তাঁরা ভাবতেন শিশিরকুমারের বুঝি অর্থকষ্টই একমাত্র কষ্ট। শিশিরকুমার এই আমন্ত্রণ কখনও গ্রহণ, কখনও প্রত্যাখ্যান কোরতেন। যখনই প্রত্যাখ্যান কোরতেন তখনই উপলব্ধি কোরতাম তিনি নটকঙ্কাল নন; নাট্যাচার্য।

চার

মাইকেলকে যারা বিধর্মী বোলেছে, তারা জানে না ধর্ম কি। সমাজধর্মের বিরুদ্ধে চিরকাল যারা বিদ্রোহ ঘোষণা কোরেছে তারা জীবনধর্মী। সমাজের ধর্ম থেকে জীবনের ধর্ম অনেক বড়। শিশিরকুমার যেদিন সমাজে: উঁচুতলা থেকে অধ্যাপকের পদ ত্যাগ কোরে নটের বিপদ মেথে নিলেন নিজের সর্বাঙ্গে, সেদিন তিনিও ছিলেন সমাজদ্রোহী। সেদিনকার সমাজের চেহারাটা এখানে তুলে ধোরলে এবক্তব্য অনুধাবন করা সহজ হবে। স্বয়ং রামকৃষ্ণের কাছে যেতে শিবনাথ শাস্ত্রীর মত লোক অনীহা প্রকাশ কোরেছেন কেন—না, যেহেতু রামকৃষ্ণের কাছে যান কে—না, গিরিশ ঘোষ, একজন অসামাজিক জীব—যেহেতু পেশাদার রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা। গিরিশচন্দ্র যদি সমাজের ধর্মে অবিচল থেকে মঞ্চে প্রবেশ না কোরতেন, তাহলে আমরা পেতাম কি করে: প্রফুল্ল, যার সংলাপ বাংলাদেশের হাউসহোল্ড প্রপার্টি আজকে। অধ্যাপকের আরাম কেদারা ত্যাগ কোরে পাদপ্রদীপের আলোকে অবতীর্ণ না হোলে শিশিরকুমার, কে উদ্বোধন করতো নাট্যলোকের নবযুগ?

মাইকেল সারা জীবন মরীচিকার পেছনে ছুটবেন, আলো বোলে মনে কোরবেন যাকে—তাকে হোতেই হবে আলেয়া। তবে তো বঙ্গসাহিত্যের সিংহদ্বারে শোনা যাবে : 'রেখো মা দাসেরে মনে'? কে মনে রাখতো মাইকেলকে, যদি গতানুগতিকতার গড্‌ডালিকায় গা-ভাসাতেন উনবিংশ শতাব্দীর কালাপাহাড়? সারাজীবন সেক্সপীয়র আর মিলটন, হোমর আর দান্তে হবার দুর্বাস্ত তামাশার শেষে, আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, লিখতো কে—যদি না সে নিজের জীবন নিয়ে জুয়া খেলায় হোতো আজীবন বিপর্যস্ত? ভুলের পর ভুল একদিন মাইকেল কোরেছিলেন বোলেই ফুলের পর ফুল ফুটিয়েছেন বঙ্গসাহিত্যের পদ্মবনে—শ্রীমধুসূদন!

শিল্পীর ধর্ম আর সমাজের ধর্ম এক নয় কখনই। সমাজ তার সুবিধে মতো ধর্ম পালটায়। শিল্পী, কখনও না। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহ—এই যার বিশ্বাস সেই শুধু শিল্পী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর শিশিরকুমার ভাদুড়ী দুজনেই জীবনশিল্পী।

জালিয়ানওলাবাগে নিরস্ত্র ভারতের ওপর পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সাহেবদের দেওয়া নাইটহুড পরিত্যাগ কোরে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি দিয়েছিলেন, তা আজ ইতিহাস হোয়ে গেছে। মোসাহেবদের দেওয়া পদ্মভূষণ প্রত্যাখ্যান কোরে শিশিরকুমার যে পত্র প্রেরণ কোরেছিলেন, তাও জাতীয় দলিল হওয়া

উচিত। সব্যসাচী বিশেষণ পার্থর হয়তো যোগ্য, কিন্তু পার্থসারথির পক্ষে তা কোনো বিশেষণ নয়—একথা মহাভারতকার জানতেন, জানেন না কেবল স্বাধীন ভারতকার। কিন্তু এ প্রতিবাদ পত্র শুধু পদ্মভূষণ পদবী, পদ্মের পক্ষে কোনও ভূষণ নয়, এই জন্যেই প্রেরিত হয়নি, এ প্রতিবাদ পত্র শিশিরকুমার পাঠিয়ে ছিলেন জাতীয় রঙ্গশালা ছাড়া আর কোনও প্রার্থনায় তথাস্তু শুনতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না বোলেই। সাবিত্রীর প্রার্থনা যমের কাছে: সত্যবানকে পুনর্জীবন দাও নইলে কিছুই দিও না।

দাতব্য হাসপাতালে মহাকবির অন্তিম কামনা ছিলো: জাতীয় সাহিত্য। শহরতলীতে শেষ শয্যায় শুয়ে মহানটের স্বপ্ন ছিলো: জাতীয় নাট্যশালা। দুজনের মহাপ্রয়াণের মধ্যে শতাব্দীর ব্যবধান। দুজনের তিরোভাব-দিবসের তারিখ কিন্তু এক: ২৯শে জুন

ইতিহাসের প্রয়োজন শিশিরকুমারকে দিয়ে হয়ত ফুরিয়েছিলো; কিন্তু শিশিরকুমারের প্রয়োজন তখনও হয়তো ফুরোয় নি। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ফুরোয় নি। প্রয়োজন ছিলো এক জাতীয় নাট্যশালার—শিশিরকুমারের আজীবনের স্বপ্ন। কেন এই নাট্যশালার বেদনা চিরকাল তিনি একা বহন কোরে কোরে বিদায় নিলেন? নিলেন তাঁর কারণ যেদিন তিনি গিরিশচন্দ্রের আরব্ধ কার্য নিজের কাঁধে তুলে নিলেন সেদিন নটের জীবন মর্যাদার ছিলো না। শিক্ষিত শিশিরকুমারের আবির্ভাব সমাজের উচ্চ মঞ্চ থেকে নাট্যসমাজকে শুধু যে জাতে তুললো তা নয়, তাকে অভিজাতও কোরে তুললো। শিশিরকুমারের সঙ্গে সঙ্গে আরও একাধিক শিক্ষিত অভিজাতরা এগিয়ে এলেন পেছনে পেছনে। সেই মহাপ্রবেশের মুহূর্ত থেকে মহাপ্রস্থানের মোমেণ্ট পর্যন্ত শিশিরকুমারের মনে যে কাঁটা খচ্‌খচ্‌ কোরে বরাবর বিঁধেছে—তা হোচ্ছে, পেশাদর মঞ্চের সকলের মন জুগিয়ে চলতে অসন্তোষের কাঁটা। সেই কাঁটা উপড়ে ফেলবার তপস্যাই তাঁর সংগ্রাম। (রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?)

নাট্যশালার প্রয়োজন কেবলমাত্র সেই কারণেই তিনি অনুভব কোরেছিলেন, এ মনে কোরলে ভুল হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে যেমন উদ্দেশ্য ছিলো যে, এই মহাবিদ্যালয় একদিন জাতীয় শিক্ষার আগার হবে, বিশ্বেরবিদ্যা সমাজের সর্বস্তরের জন্যে অবারিত কোরবে। এই মহতী উদ্দেশ্যের যাঁরা মশালধারী ছিলেন—তাঁরা এই কারণেই মহান্ত পুরুষ। শিশিরকুমারও ছিলেন এঁদের মনপ্রোত্রীয়। জাতীয় নাট্যশালাকে তিনি জাতীয় শিক্ষার সবচেয়ে বড় পাদপীঠ বোলে মনে কোরতেন। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে শুধু এনটারটেন্‌মেণ্টের—এনতার এনটারটেন্‌মেণ্টের ঢালোয়া ফরাস পাতা। কিন্তু নিছক এনটারটেন্‌মেণ্ট নয়—এনটারটেন্‌মেণ্ট থেকে এটোন্‌মেণ্ট চেয়েছিলেন নাট্যাচার্য। নিজের জন্যে নয়, বিশ্বচিন্তা এবং জীবন জিজ্ঞাসার গভীরে নাড়া দেওয়ার মতো নাটকের জন্যে অপেক্ষা কোরে আছে যে নাট্যপিপাসু চাতকের দল, তাদের হোয়েই ব্যাকুল হয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন—নাট্যলোকে নবযুগের মহৎ প্রবর্তক। সেই জাতীয় জীবন্ত রঙ্গশালা সেখানে, 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে!' নাটক, দর্শক, অভিনয়, থ্রি ডাইমেনশানের ওপর, জাতীয় রঙ্গশালার অনিবার্য প্রয়োজন যার জন্যে শিশিরকুমার অনুভব কোরেছিলেন—তার আরেক ডাইমেনশান—যা হচ্ছে ভালো দর্শক সৃষ্টি করার মহত্তম দায়িত্ব। অর্থাৎ মহৎ এনটারটেনমেণ্টের জন্যে বৃহৎ দৃষ্টিকোণের প্রয়োজনীয়তা। এরই জন্যে প্রয়োজন ছিলো জাতীয় রঙ্গশালার। সেকাজ শিশিরকুমারের একার ছিলোনা, ছিলো সকল সুধীজনের, সেই কাজ একা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। সাহেবদের আমলে যার সুরাহা সম্ভব হয়নি; মোসাহেবদের আমলে তা আরও অসম্ভব হোলো। তাই ভালোই হোয়েছে যে শিশিরকুমার আজ নেই। সূর্যের স্বপ্ন নিয়ে শতচক্ষে সূর্যাস্তে অপেক্ষা কোরবে শতদল নবপ্রভাতের জন্যে। শতদলের স্বপ্ন ছিলো—ফুটে উঠবে সে বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের পাপড়ী মেলে সেইখানে, যেখানে এসে মিলতে পারে সকল দেশের সকল কালের গন্ধে মাতাল পদ্মলোভীর দল।

উর্বশীর তালভঙ্গ অকৃতজ্ঞ দেবতা মহলে
পায়নি কখনো ক্ষমা। অবশেষে মর্তে নির্বাসন
অনিবার্য হোয়ে এলে বহুভোগ্যা ছুচোখের জলে
শুনেছে বিকল্প সেই শিল্পের নিরিখে আমরণ।
এমনকি যুধিষ্ঠির, স্বর্গ আরোহণে তারো পাছে
নীরব কুকুর দেখ অতীতের অশ্বত্থামা স্মৃতি
নির্বিবাদে বোহে চলে। অতএব সময়ের কাছে
অমৃতের অধিকার পেতে চাওয়া বাতুলের রীতি।

তুমি তবু যুদ্ধ জানি আকাশের দিগ্বিজয়ী নীলে।
বিশ্বাসের ব্যাপ্তি নিয়ে ভাললাগা শতরূপা নারী
আনন্দ জাহ্নবী হবে। জরা মৃত্যু নিয়ত নিখিলে,
শিশুর আনন্দ, শেষে হয়তোবা তোমার দিশারী।
এই নিয়ে তুমি বাঁচো, আমি জানি, কিছুই থাকেনা
শিল্পের দ্বিতীয় স্বর্গ — এজীবন কখনো জানেনা॥

— সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত —

অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত
ওমর খৈয়ামের
একটী চিত্রায়ন।

অবনীন্দ্রনাথ

কানাই সামন্ত

অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের স্নেহধন্য। সাহিত্যে স্বনামখ্যাত। 'উর্বশী' 'চিত্রোৎপলা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং 'চিত্রদর্শন' সমালোচনা গ্রন্থ তাঁর প্রতিভার একটি চিহ্নিত ফলশ্রুতি।

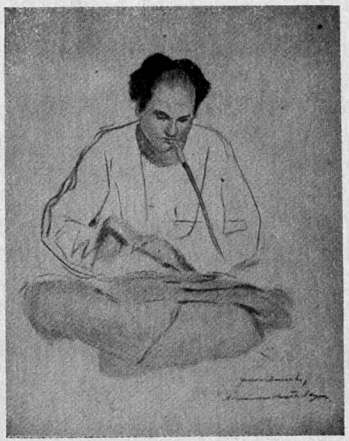

একটি বিখ্যাত বিদেশী শিল্পীর অঙ্কিত অবনীন্দ্র-প্রতিকৃতির প্রতিলিপি

অবনীন্দ্র-প্রতিভার বিচার ও ব্যাখ্যা নানা দিক থেকে নানা জনে করেছেন। এই ক্ষণজন্মা শিল্পীর বিচিত্র ও বিশিষ্ট রূপসৃষ্টির আদ্যন্ত বিস্ময়করতা রসজ্ঞ ধীমান ব্যক্তির অজ্ঞাত বা অপরিচিত নয়। তবু হয়তো সব কথা বলা হয়নি, অথবা মুখ্য কথাটি নানাবিধ গৌণ, এমন-কি অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার ডাল-পালায়, ফুলে-পল্লবে—হোক-না কেন ভক্তিপ্রীতির অর্ঘ্য—আবৃত হয়েছে। এই উচিত বা অনুচিত ঘটনার অনিবার্য হেতু অনেক আছে স্বীকার করি। এক তো, প্রাচীনের ভাষায় বলতে গেলে, স্বে মহিম্নি, আপনার মহিমায়, আপনাকে গোপন করে বিশাল প্রতিভা।

সমকালীন সুধীজন অদূরে দাঁড়িয়ে, আলগোছে, একটি সঙ্গত ধারণায় পৌঁছুতে পারেন না—তার কারণ তার অ-পূর্বতা। পূর্বপরিচিত কোন্ সৃষ্টির

সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে প্রত্যাশিত রসাস্বাদে তৃপ্ত হবেন রসিক? তিনি তো স্রষ্টা নন। নিত্যনবীন রূপকে বরণ করবার উপযোগী নব-নবোন্মেষশীল দৃষ্টির অধিকারী নন। কাছাকাছি এলেও অন্য এক অসুবিধা। বিশেষতঃ অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। ব্যক্তিত্ব তাঁর এমন প্রবল প্রচুর, এত বিচিত্র যে, অভিভূত না হয়ে উপায় ছিল না। সেই প্রাচুর্য আর বৈচিত্র্যের মধ্যে বহু স্ববিরোধী আচরণের, বিশেষতঃ উক্তির, স্বচ্ছন্দ অবকাশ ছিল।

যা বৃহৎ, যা প্রাণবান্, তার মধ্যে স্ববিরোধ থাকেই — সেটা কিছু একান্ত নয়। সমস্ত বিরুদ্ধ মতি প্রবৃত্তি ও শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে সৃষ্টিকার্য এগিয়ে চলে. ক্ষণে ক্ষণে এক-একটি সুরসমন্বয়ের বা রূপসমন্বয়ের উদ্ভব হয় — সেই হল এক-একটি ছবি বা কবিতা বা গান। আবার, কোনো অসামান্য প্রতিভার সমুদয় জীবনের কৃতকার্যকে যদি মনোনেত্রে একত্র দেখি, সেও দেখতে পাই ছন্দোময় অখণ্ড অপূর্ব একটি সংগতি, নির্দিষ্ট স্থলে নিরূপিত একটি শমে এসে শেষ হয়েছে — আর, আসলে কোনোদিন শেষ হবেও না।

অবনীন্দ্র-প্রতিভার দিগ্‌ভ্রষ্ট ভ্রান্ত বিচারের বিশেষ কারণ হল ঐতিহাসিক। তাঁর জন্ম এবং কর্ম যে ইতিহাসবিধাতার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে, তাঁরই প্রবর্তনায় — তাঁরই নির্দেশে — সেদিন এই ভারতভূমিতে, বিশেষতঃ বাংলায়, দেশীয় এবং বিদেশীয়, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য, ব্যবহার বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রচণ্ড সংঘর্ষে নীতনিদ্র দেশানুরাগ ও জাতিপ্রীতির আবেগ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। আঘাত মাত্রই আনে বেদনা। আবেগ একান্ত অন্ধ না হলেও তার দৃষ্টি হয় না স্বচ্ছ, নীরঞ্জন। দীর্ঘকাল সেই দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে ব'লেই, পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত দেখেছেন অবনীন্দ্র-চিত্ররুচিতে শিল্পসাঙ্কর্য, বিজাতীয় প্রভাব, ভারতীয় রূপরুচিতে অভারতীয়ের প্রাদুর্ভাব। এ দিকে স্বদেশভক্ত রূপরসিক উল্লসিত হয়েছেন এই ব'লে যে, অবনীন্দ্রনাথের তথা অবনীন্দ্র-গোষ্ঠীর এ সৃষ্টির জাতীয়, ভারতীয় — অজন্তাবাগের, রাজস্থানে কাংড়ায়, দিল্লি-আগ্রায় যে রূপসৃষ্টি হয়ে গেছে পূর্ব পূর্ব শতাব্দীতে তারই অনুকারী না হোক, ধারাবাহী তো বটেই, অতএব সার্থক ও আদরণীয়।

আদর-অনাদরের এই বহু বিরুদ্ধ ভাষণের মধ্যে, তাঁদের কথাও অবশ্য ভুললে চলবে না যাঁরা একমাত্র 'সহজ বুদ্ধি'তে বুঝে নিয়েছিলেন, ছবির আবার দেশী বিদেশী কী — প্রাচীন, অপটু, অপরিণত এক দিকে — আর, অন্য দিকে আধুনিক[১] পাশ্চাত্য চিত্রকলা, যা প্রৌঢ়পরিণত, যা ইন্দ্রিয়গোচর ও প্রাণের উদ্‌বোধক ভাবভঙ্গী ও রূপের বিস্ময়কর অনুকৃতি। শেষোক্ত অভিমতের আজকের বাজারে কোনোই মূল্য নেই সত্য; সেদিন ওরই সঙ্গে সঙ্গে ছিল স্বভাববিজ্ঞের অন্ধ অভিমান আর দ্বিধাহীন উচ্চ কণ্ঠ।

আশা হয়, অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্ট চিত্রকলা আজ এমন এক সংগত পরিপ্রেক্ষিতে স্থান পেয়েছে যে, স্বভাবে ও স্বধর্মেই গোচর হতে পারে আর মনোহরণ করতে পারে রসিকের। যেমন দূরেও নয় তেমনি খুব কাছেও নয়। পাশ্চাত্য রূপকলার সাম্প্রতিক প্রমত্ততা ও লক্ষ্যহীন ঘূর্ণাবর্তগতি — তারই প্রবল টানে তাবৎ রসিক-সমাজ আত্মহারা চেতনাহারা হন নি। তবু অসুবিধা এই যে, সূক্ষ্ম-বর্ণ-সুষমাময় ব্যঞ্জনাময় চিত্রালি চোখে যে না দেখেছে, মন দিয়ে বারম্বার না দেখেছে, প্রতিচিত্র দেখে সে তার স্বভাবের ও সৌন্দর্যের বিশেষ ধারণা করতে পারবে না। অবনীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছবির প্রতিচ্ছবি হয় না — অথবা, সে একই কথা, আমাদের দেশে এ পর্যন্ত হতে পারে নি।

অবনীন্দ্রনাথ ক্ষণজন্মা শিল্পী, অ-পূর্ব চিত্ররূপের স্রষ্টা, অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী, জগতে শ্রেষ্ঠ রূপকার কালে কালে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদেরই একজন। অবনীন্দ্রনাথের সম্পর্কে এই হল সার কথা। অবনীন্দ্রনাথের সময়ে বাস্তবতঃ পরাধীন ছিল দেশ। পরাধীনতার

১ আজকের 'আধুনিক' নয়। এই অশিক্ষিতপটু সমালোচকেরা চোখ দিয়েই দেখেছিলেন বিলাতি চিত্রকলা; প্রাণের উদ্‌বোধক কোনো গুণের কোনো আভাস পেয়েছিলেন কি না নিশ্চিত বলা যায় না।

নাগপাশ আজও হয়তো সম্পূর্ণ ঘোচে নি দেশের মন থেকে। বাহ্য পরাধীনতার চেয়ে আন্তরিক সেই 'পরপ্রীতি', পরানুবৃত্তি আরও ভয়ংকর। আর, সেই কারণেই ঘরের ঠাকুর ফেলে বিদেশের মাটির ঢেলাকে যদি বা বেশি সম্মান দিই, অস্বাভাবিক অবস্থাতে সেটাই 'স্বাভাবিক' জানি।

সে ক্ষেত্রে রূপস্রষ্টা হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের যে শ্রেষ্ঠতা আমাদের বিচারে, আমাদের বোধে, স্বতই প্রতিভাত হয়েছে, সেটি দ্বার্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করাই আমাদের মুখ্য কর্তব্য বলে মনে করি।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্ররুতির একটি ঐতিহাসিক মূল্য ও মর্যাদা আছে সত্য। কিন্তু, সেটিও প'ড়ে-পাওয়া সামান্য জিনিস নয় বা আকস্মিক নয়। নিতান্ত ঘটনা-ক্রমে দেশকালের বিশেষ এক সন্ধিস্থলে এসে পড়েছে ব'লেই নয়। ভারতীয় চিত্রকলার একটি অনিবার্য পরিণাম তাঁরই কাজের ভিতরে সার্থক হয়েছে, পূর্ণ হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, যুগ-যুগ-প্রবাহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুটি ধারা এসে তাঁর বিশাল প্রতিভায়, মৌলিক রূপরুচিতে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বেলায় যেটি হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রে, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথে। (এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্য নিখিল ভারতীয় সাহিত্যেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে, পথিকৃৎ হয়েছে।) এটি তো সামান্য ঘটনা নয়। সভা আহ্বান ক'রে, সংকল্প গ্রহণ ক'রে, প্রাণান্ত পরিশ্রমে বা চেষ্টায়, সম্ভব ছিল না এটিকে ঘটিয়ে তোলা বা রোধ করা। এ এক আশ্চর্য রহস্য।

প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হয়েছে অজন্তার ধ্রুবরীতির সঙ্গে উৎকৃষ্ট মোগল-চিত্ররীতির স্বজাতীয়তা। আশ্চর্য এই যে, আকবর-জহাঙ্গীরের শাহী দরবারে কে জানত অজন্তা-বাগের ওহাহিত ঐশ্বর্য! তবুও যোগসূত্র নষ্ট হয় নি। এই মোগল-চিত্ররীতি কিভাবে নষ্ট হল আমাদের জানা আছে। মুখ্যতঃ এজন্য নয় যে, মোগল-সাম্রাজ্য রইল না, 'নিশার স্বপন সম' মিলিয়ে গেল তার রাজৈশ্বর্য ও প্রতাপ। স্বভাবের ছন্দোময় অনুবৃত্তি অজন্তা-চিত্ররীতিতে ছিল না এমন নয়, মোগল-চিত্ররীতিতেও অবশ্যই ছিল। এই অবস্থায় দিল্লি-আগ্রার দরবারে এল যখন নবজাগ্রত য়ুরোপের নূতন চিত্রকলা, তার প্রবল প্রচুর অলজ্জ বাস্তবতা, সে যে অপ্রত্যাশিত চমক লাগালো না অধিকাংশের চক্ষে তাও নয় এবং দিনে দিনে অধিপ্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার অবসাদ যতই বেড়ে চলল, ধূলিস্তর সঞ্চিত হতে থাকল বোধে এবং বুদ্ধিতে, প্রথমে যা চোখ ভুলিয়েছিল ক্রমে তা মন ভুলিয়ে নিল, নবাব-বাদশা আমীর-ওমরাহের আদেশ হল আর অন্নমতি শিল্পীদেরও আগ্রহ হল — বাস্তবানুকারী য়ুরোপীয় চিত্রকলার অনুকরণে। ভিতর থেকেই মৃত্যু হল। যে রসের উৎস ছিল প্রাণের ভিতর ক্রমে তা শুকিয়ে গেল। একান্তভাবে পরধর্ম আশ্রয় করেই বাঁচবে যে, সে সুযোগ আর সম্ভাবনাও থাকল না মোগল-চিত্রকলায়। একটা দিকে আকস্মিক ছেদ পড়ল ভারতীয় চিত্রকলায়। এ ধারে, ও ধারে, কিছুকাল টিকে রইল সত্য পাটা এবং পট, রাজস্থান ও কাংড়া কলমেরছবি, বিশেষতঃ ব্যবহারিক কারুকলা। সে আর কত দিন? মনে হল ভীমরতি-ধরা প্রাচীন প্রাচীকে নবীন য়ুরোপের পাদপ্রান্তে বসে প্রথম থেকেই শিখতে হবে চিত্রকলা, মূর্তিকলা — আসবাবপত্রে বসনে-ভূষণে শয্যাসনে দেশীয় কারুকর্ম, অর্থাৎ অলংকরণ ও বর্ণরুচি, নিন্দনীয় যে তা নয়, তবে বৈচিত্র্যের ও নূতনত্বের খাতিরে সেখানেও অনেক-কিছু আমাদের নেবার আছে নূতন গুরুকুল থেকে। অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, তাঁর জন্ম ও কর্ম, এদেশীয় শিল্প ও সংস্কৃতির এই নিদারুণ ক্রান্তিকালে। ভারত-শিল্পসাধনার যে সূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তাতেই আবার জোড়া লাগাতে হবে, পুরাতন অক্ষগুটিগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুখস্থ বীজমন্ত্র উচ্চারণ করলেই চলবেনা, নব নব মণিমানিক্যে হার গেঁথে ললাটে পরাতে হবে, কণ্ঠে দুলিয়ে দিতে হবে ভারত-ভারতীর — নূতন বন্দনাগানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে নিঃশব্দ দেবীমন্দির — এ নির্দেশ তাঁকে কে দিয়েছিল! রাষ্ট্র বা সমাজ, রাজা বা মহারাজা, সামন্ত বা শ্রেষ্ঠী, এরা কেউ নয়।

পাঠশালা-পলাতক ছেলে নিজেরই খেয়ালে নিবিষ্টচিত্তে আঁকেন চিত্র-বিচিত্র। পরে বিলাতি

আর্ট শিখলেন বিলাতি গুরুর কাছে — আর্টস্কুলের বাঁধাধরা কার্যক্রমের মধ্যে নয় যদিও — নিজেরই ইচ্ছাসুখে। সেই শিক্ষায় প্রথম গুরু হলেন তাঁর কলিকাতা আর্টস্কুলের উপাধ্যক্ষ, ইটালিয়ান শিল্পী ও. গিলার্ডি। তেলরঙের কাজে ও প্রতিকৃতি - অঙ্কনে হাত তৈরি হল কিছুদুর। পরে আবার শেখেন ইংরেজ আর্টিস্ট্ সি. এল. পামারের কাছে। সেই তেল-রঙের কাজ ও প্যাস্টেল (কিটলেখনী), বিলাতী কায়দায় ভাড়া - করা মডেল বা আদর্শ সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে পেশী ও অঙ্গ - সংস্থানের তন্ন তন্ন সন্ধান। এই সময়ের একটি ঘটনায় অবনীন্দ্র - চরিত্রের বিশেষ সৌকুমার্য এবং এই প্রতিভার নিজস্ব প্রকৃতি সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের নিজের ভাষা তুলে দেওয়া যাক্।—

সাহেব বললেন, 'আমার যা শেখাবার তা আমি তোমায় শিখিয়ে দিয়েছি। এবারে তোমার অ্যানাটমি স্টাডি করা দরকার।' এই বলে একটা মড়ার মাথা আঁকতে দিলেন। সেটা দেখেই আমার মনে হল যেন কী একটা রোগের বীজ আমার দিকে হাওয়ায় ভেসে আসছে। সাহেবকে বললুম, 'আমার যেন কী রকম মনে হচ্ছে।' সাহেব বললেন, 'No, you must do it ! তোমাকে এটা করতেই হবে!' ... কোনোরকমে শেষ করে দিয়ে যখন ফিরলুম তখন ১০৬° ডিগ্রি জ্বর। [২]

কী জানি এরই আগে অথবা পরে [৩] আশ্রয় নিলেন অবনীন্দ্রনাথ মা-গঙ্গার কোলটিতে, মুঙ্গের কষ্টহারিণীর ঘাটে বা বিশ্রাম ঘাটে। (মনশ্চক্ষে দেখা যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী থেকে আরও অনেক অনেক দিন আপনার ধ্যানের ধনকে চেয়েছেন এই কষ্টহারিণীর ভাঙা পৈঁঠেয় ব'সে। সে কথা থাক্।) শিল্পী তেল-রঙ ছেড়ে জল-রঙে আঁকতে লাগলেন মুগ্ধ-চোখ-দিয়ে-দেখা মন-দিয়ে-ছোঁয়া বিবিধ রূপ। কোলকাতায় ফিরে এসে আরো কিছুদিন শিক্ষা নিলেন জল-রঙের। দিন যায়, বৎসর যায়. স্বেচ্ছাব্রত তপস্যায় বিশ্রাম বা বিরতি নেই। কিন্তু, কবির ভাষায় বলতে গেলে, 'তবু ভরিল না চিত্ত'। প্রতিভার এই বয়ঃসন্ধিসময়ে, এক দিকে বুড়ি মার্টিন্‌ডেল, ছোট্দাদা-মহাশয়েরবন্ধু, বিলেত থেকে পাঠালেন স্বহস্তে-চিত্রকরা 'আইরিশ মেলডিজ'এর দশ-বারোখানি পাতা; অন্য দিকে ভগ্নীপতি শেষেন্দ্র পাঠালেন দিল্লি থেকে 'পার্শিয়ান ছবির বই'[৪], যার কবিত্বময় চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন বলেন্দ্রনাথ 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' প্রবন্ধে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন —

এক দিকে আমার পুরাতন ইউরোপীয়ান আর্টের নিদর্শন ও আর-এক দিকে এ দেশের পুরাতন চিত্রের নিদর্শন। দুই দিকের দুই পুরাতন চিত্রকলার গোড়াকার কথা একই। সে যে আমার কী আনন্দ ...

ভারতশিল্পের তো একটা উদ্দিশ পেলুম। এখন শুরু করা যাবে কী ক'রে কাজ? ... দেশের রাস্তা তো পেয়ে গেছি, এখন আঁকব কী? ... রবিকাকা আমাকে এই পর্যন্ত বাৎলে দিলেন যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতাকে রূপ দিতে হবে। [৫]

তখন যে আনন্দে ও উৎসাহে সুরস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া, ঠিক তেমনি আনন্দে ও উৎসাহে রূপস্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথ আঁকতে লাগলেন 'কৃষ্ণলীলা'। আশ্চর্য এই যে, একই 'আইরিশ মেলডিজ' যেমন কবিকে তেমনি শিল্পীকেও প্রভূত প্রেরণা জোগাবার কারণ ঘটেছিল। কৃষ্ণলীলার এই বর্ণাঢ্য দৃশ্যকবিতাগুলির সাক্ষাৎ পরিচয়ে পামার

---

২ জোড়াসাঁকোর ধারে। এই প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত বালক রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা স্মরণীয়। নিজেদের 'স্কুল-ঘরে' আস্ত একটি নরকঙ্কাল গা-সওয়া হয়ে যাওয়ার পরেও, বিচ্ছিন্ন একটি মনুষ্যকণ্ঠনলী দেখে, তরুণ মাষ্টার মশায়ের বহু উচ্ছ্বাস-সত্ত্বেও পুলকিত হতে পারেন নি, আর মেডিকেল কলেজের শবব্যবচ্ছেদের ঘরে গিয়েও বালকের ইন্দ্রিয় এবং মন পীড়া বোধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে ছিল একই সৌকুমার্য। জ্ঞানপিপাসা হয়তো বেশি ছিল, সেই সঙ্গে মনোবল ও স্নায়বিক সহনশীলতা। তবে গোটা মানুষের তত্ত্ব যে, আংশিক অনুপাতেও তার কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নেই — সজীব সৌন্দর্য ও প্রাণ যে সকল রকম ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অতীত — প্রতিভাবান বালকের পক্ষে সেটি বুঝতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় নি।

৩ খৃষ্টীয় ১৯০০ সাল। মুকুল দে : Visva-Bharati Quarterly, May-Oct. 1942

৪ আসলে পাটনা কলমের ছবি।

৫ জোড়াসাঁকোর ধারে।

বললেন, 'নিজের রাস্তা তুমি পেয়ে গেছ। আর ঘুরে বেড়াতে হবে না বাইরে।'[৬]

পরে এই 'কৃষ্ণলীলা'র পরিচয়েই ভারত-প্রেমিক ই. বি. হ্যাভেল নিমেষে চিনে নিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথকে অলক্ষ্য ভাবীকালের আসনে কলালক্ষ্মীর নিজের হাতে বরণ করা শিল্পী ব'লে সযত্নে মোগল-চিত্রকলার সূক্ষ্ম সুকুমার শৈলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, এবং ম্রিয়মাণ মুমূর্ষু পরম্পরায় নবজীবন-সঞ্চারের দুরূহ ব্রতে তাঁকে চেয়েছিলেন, সমর্থ সহযোগীরূপে।

ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা - বিকাশের আনুপূর্বিক বিবরণ দেওয়া যাবে না, আর তার প্রয়োজনও নেই। সে দায় যোগ্যতর ব্যক্তি হাতে তুলে নেবেন। (কবে, সে অবশ্য জানি নে।) অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা-রূপ রূপকথায় নির্ভেজাল তথ্য না থাক, শিল্পীর জীবনের ও মনের সত্য ছবি একটি সুন্দর ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই — সেই সঙ্গে পাওয়া যায় সমকালীন নানা জনের নানা খণ্ডবিখণ্ড আলোচনা। যেটুকু বিবরণ এখানে সংকলন করা গেল তার বিশেষ তাৎপর্য এই যে —

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ নিজের রাস্তা নিজেই এক রকম খুঁজে বার করেছেন, অন্তরের আবেগে আর অনুকূল ঘটনা-সমাবেশে।

তা ছাড়া, পাঠশালা-পালানো জেদী মনোবৃত্তি যতই থাক্ (মৌলিক প্রতিভার সঙ্গে এ যেন না থেকেই পারে না) তৎকালপ্রচলিত বিলাতি করণ - কৌশল তিনি অতিযত্নেই আয়ত্ত করেছিলেন। অবশ্য, 'দ্বাদশবর্ষাণি' ব্যাকরণ পড়তে হয় শতকরা নিরানব্বই জনকে, এতটা সময় তাঁর লাগে নি, যেহেতু তিনি ছিলেন এক শো'র মধ্যে একজন — হয়তো লক্ষের মধ্যেও অদ্বিতীয়।

মনে পড়ে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের ওপারে বিস্মৃতপ্রায় একটি শীতের সকালে, পাঁচ-নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর গলির অধুনাবিলুপ্ত দক্ষিণের বারান্দায়, স্মিত - কৌতুকে কী বলেছিলেন শিল্পীগুরু তরুণ এক শিল্প - শিক্ষার্থীকে — 'এ পথ জেনো, হয় বাদ্‌শার নয়তো ফকিরের।' শুন্‌তে পাই তরুণ নন্দলালকেও তিনি এই কথাই বলেছিলেন। আজ ধারণা হয়েছে, এ পথ বিশেষ ক'রে তারই যে একাধারে বাদশা আর ফকির, জ্ঞানগম্ভীর আর শিশু। এই দুর্লভ দ্বৈতের অপূর্ব সমাবেশ দেখেছি অবনীন্দ্রনাথে সে কথা ভোলা যায় না, আর ভুলি যদি তা হলে এই রূপস্রষ্টাকে ও তাঁর সৃষ্টিকে বুঝব কী উপায়ে। বাদশা আর ফকির উভয়েই স্বতন্ত্র, স্বাধীন।

কারও মন রাখার কোনো দায় নেই তাঁদের। এ কথা তাঁরাই বলতে পারেন : তদ্‌রম্যং যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ। আর, একাধারে যে বাদশা ও ফকির, এক সঙ্গে তারই তো ত্যাগ এবং ভোগ। কেননা, অতুল ঐশ্বর্য্য থাক্ বাইরে —

অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।

আবার এর বিপরীতও দেখো, যখন রিক্ততাতেই তার আসন তখনও অন্তরের ঐশ্বর্য তার কল্পনা করতে পারে না লক্ষপতি কোটিপতি ধনী — রূপের ঐশ্বর্য, রসের অফুরন্ত ফোয়ারা, চেতনা, বেদনা, আনন্দ। নিষ্কাম নিরভিমান সে শিশু। জীবন যদি সত্যই রঙ্গমঞ্চ হয়, স্বভাবতঃই সে নট — আয়াস বা অভ্যাসের প্রয়োজন নেই, তাই কৃত্রিমতাও নেই। রূপরসিক পরমহংস বলতে পারো। মহান্ শিল্পীর এই-যে রূপ কল্পনা করা গেল বস্তুতঃ এটি কল্পনা নয়। এ আমাদের প্রত্যক্ষ। এইটিই আসল অবনীন্দ্রনাথ। চোখে যে দেখেছে, হৃদয় দিয়ে বুঝেছে, সেই ধন্য হয়েছে এবং জেনেছে যে, এই অতুলনীয় ব্যক্তিসত্তারই কী-একটা বিশ্লেষণাতীত স্পর্শ রয়েছে অবনীন্দ্রনাথের সকল রূপ-সৃষ্টিতে। বিশ্লেষণ হয় না এমন রসাত্মার কথা না হয় থাক্, এই অভিনব সৃষ্টির দেহগঠন ও প্রাণধর্মের

---

৬ Charles Palmer : I should strongly advise you to proceed in this line ... these pictures have a character of their own. You require no studies! from life any more.

—যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় : V. B. Q. May-Oct. 1942.

কিছু পরিচয় যদি পাই তা হলেও বিশেষ সৌভাগ্য বলতে হবে।

আই কী নিঃশেষে বলা যায় না, কিন্তু আর্টিষ্টের আঁকা ছবিকে নানা দিক থেকেই বিচার করা যায়। বিভিন্ন আর্টিষ্ট ও সে কাজ করেছেন। শিল্পকথা গ্রন্থে 'শিল্পপরিচয়' প্রবন্ধে শিল্পী নন্দলাল বিচার করেছেন ছন্দের দিক থেকে, গতির দিক থেকে, অর্থাৎ আপাতস্থির রূপের রেখায়-রেখায়-গতিশীল ভঙ্গীর দিক থেকে। বলেছেন, স্বগত, শ্রেণীগত, সার্বজনীন, ত্রিবিধ ছন্দের আশ্রয়ে তিন ধরণের ছবি দেখা যায়— অনুকারক, ব্যঞ্জক, ছান্দসিক। একদা অবনীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছিলেন রূপের দিক থেকে। ঘূর্ণমান ছায়াতপপুঞ্জের ভিতর থেকে রঙো নীহারিকালোকে থেকে থেকে এক একটি রূপ কিভাবে জেগে উঠছে, শিল্পীর — তেমনি — রসিকের — মুখের দিকে চেয়ে থাকছে সুস্মিত স্থিরলাবণ্যে। মুখে বলেছিলেন আর প্রবন্ধেও লিখেছেন, ছবিতে থাকে রূপসাদৃশ্য, কল্পনা-সাদৃশ্য, ভাবসাদৃশ্য। একটি থাকলেই অন্য দুটি থাকবে না এমন নয়। তিনটিই থাকবে, তবে মুখ্য লক্ষণটি দেখেই চিত্রের ঠিকুজি - কোষ্ঠি রচনা করা সম্ভব হবে।

রূপের সদৃশ রূপ — কল্পনার প্রেরণে ও ভাবের আবেশে তার মধ্যেও থাকতে পারে বহুবিধ স্বগত ভেদ। কতখানি চোখের দেখা আর কতটা মনের রচনা। মন যখন সজ্ঞানেই সৃষ্টিকর্তা হয়ে বসে, কোনো রূপের সঙ্গে কোনো রূপ মেলাবার বায়না সে নেয় না, ইচ্ছাসুখে কল্পবৃক্ষতলে কল্পিত বা স্বপ্নে-দেখা দেবদেবী অপ্সরকিন্নরের আনন্দ-উৎসবও উন্মোচিত ক'রে বসে — দেখে দেখে রসিকের মুগ্ধ দৃষ্টি বলতে পারে না চেনা বা অচেনা। ভাবসাদৃশ্যে শিল্পী রচনা করে ভাবেরই রূপ, নিবিড় ও গভীর উপলব্ধির আধার, সুখদুঃখ রাগবিরাগ বিষাদ শোক ও শান্তির অপূর্ব প্রত্যক্ষতা। কত ঋতুর কত ভাব, প্রভাতসন্ধ্যার, দিবসরাত্রির। অরণ্য পর্বত সরিৎ সিন্ধুর, হয়তো বা গানের, গন্ধের। কেননা, ভাব থেকে রূপে, তেমনি রূপ থেকে ভাবে 'অবিরাম যাওয়া - আসা'। আবার তো অবনীন্দ্রনাথের মুখের কথাই সংকলন করতে হয়। শিল্পী মুসৌরি পাহাড়ে যখন ছিলেন —

সে যেন কিন্নরের গান, শুনে এসেছি রোজ দুবেলা। গান তো নয়, যেন চন্দ্র-সূর্যকে বন্দনা করতো তারা। ···বহুদিন পরে কোলকাতায় তারাই সব এক এক করে ফুটে বের হল আমার একরাশ পাখির ছবিতে। দেখে নিয়ো, তার ভিতরে সুর আছে কিছু কিছু... সে কত পাখি, সব চোখেও দেখি নি, কানে শুনেছি তাদের গান।৭

আবার বলছেন —

সন্ধ্যে হচ্ছে বসে আছি বারান্দায়, বাংলা দেশে সেদিন বিজয়া। হঠাৎ দেখি চেয়ে লাল আলো পর পর পাহাড়গুলির উপর দিয়ে চলে গেল। সেই আলোয় পাহাড়গুলির উপরে ঘাস পাতা ঝিলমিল্ করে উঠল। মনে হল যেন ভগবতী আজ ফিরে গেলেন কৈলাসে, আঁচল থেকে খসা সোনার কুচি সব দিকে দিকে ছড়াতে ছড়াতে। রঙ, আলোর ঝিলমিল্, তার সঙ্গে একটু ভাব — উমা ফিরে আসছেন কৈলাসে'। তখনি ধরে রাখল মন। কোলকাতায় এসে এই ছবি আঁকতে বসলুম। ঠিকঠাক সেই ভাবেই কি বের হলো ছবি? তা তো নয়, মনের কোণ থেকে বেরিয়ে এল সোনালি - রুপালি রঙ নিয়ে সুন্দরী একটি সন্ধ্যার পাখি — সে বাসায় ফিরছে। মনের এ কারখানা বুঝতে পারি নে। ···অনেক ছবিই আমার তাই — মনের তলা থেকে উঠে-আসা বস্তু।৭

এই-যে বহুরূপী পাখিগুলি, কখনো গানের, কখনো ধূপছায়ার, কখনো 'বিজয়া'য় করুণ বিষাদের বিচিত্র প্রতীক বা প্রতিমা, এগুলি সবই শিহরিত শিল্পীহৃদয়ের বিভিন্ন ভাবেরই সদৃশ। রূপসাদৃশ্য এখানে থেকেও নেই, খুবই গৌণ বলা যেতে পারে। করামলকবৎ রূপসাদৃশ্য, শিল্পীর আরও অজস্র ছবিতে এমনি অপ্রধান ভূমিকাতেই বর্তে আছে, প্রধান হয়ে উঠেছে কল্পনা-সাদৃশ্য, অথবা ভাবসাদৃশ্য—

অবনীন্দ্রনাথের নিখিল চিত্রকৃতি পর্যালোচনা করলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। 'ফাল্গুনী'র চিত্রপর্যায়, কাজরী-উৎসব, যাত্রাশেষ, বসন্তসেনা, শিবসদাগর, শিবসীমন্তিনী, সমুদ্রসৈকতের সঙ্কীর্তনে শ্রীচৈতন্য, শ্বেতময়ূর, উতলা নীলকণ্ঠ ময়ূর, সাজাদপুরের প্রায় সবগুলি দৃশ্যপট — কোথাও রূপ পরিস্ফুট, কোথাও রঙ - কুয়াশায় ঈষৎ - গুণ্ঠিত — সর্বত্রই যেন অবনীন্দ্র-প্রতিভার ঐ বিশেষ স্বভাব, দৃষ্টি সহজেই ধরা পড়েছে। অথচ বাস্তব রূপকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা, তার প্রত্যেক অঙ্গ - প্রত্যঙ্গটি সাক্ষাৎপরিচয়ে ভালো ভাবে জানা — সে বিষয়ে কোনো ত্রুটি বা শৈথিল্য নেই সেও আমরা জানি। বিলাতী গুরুকুলে শিক্ষাগ্রহণ মিথ্যা হয় নি। বস্তুরূপ জানা নেই ব'লেই অনুমানে বা কল্পনায় আত্মগোপন, প্রথাসিদ্ধ প্রাচীন রূপকল্পে দাগা বুলিয়ে কাজ সারা, কোনোরূপে কিছু এড়িয়ে যাওয়া বা গোঁজামিল চালানো — অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ-সবই কল্পনাতীত।

বস্তুতঃ, বাস্তবের সুদৃঢ় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপরেই চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের ভাব ও কল্পনার অপরূপ মায়াপুরী বিরচিত। অবাস্তব আবেগে এবং অলৌকিক মন্ত্রবলে নয়। পাশ্চাত্য বস্তুজ্ঞান তিনি সংগ্রহ করেছেন সন্দেহ নেই, প্রাচ্যের ধ্যানমগ্নতাও কিছুমাত্র বর্জন করেন নি, উভয়কেই যে ভাবে ব্যবহার করেছেন তাতেই তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্ররীতির সংগত একটি সমন্বয় ঘটিয়ে তোলার আশ্চর্য সিদ্ধি।

শিক্ষানবিশির পালা শেষ করার পর, বস্তুরূপের সাধ্যসাধনায় আর তিনি অধিক কালক্ষেপ করেন নি সত্য, করার বিশেষ প্রয়োজনও হয় নি, তা ব'লে চোখ বন্ধ রাখেন নি একমুহূর্ত, সন্ধানী স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে যা-কিছু চোখে দেখা যায়। তার উপরেই কাজ করেছে হৃদয় এবং মন ভাবনা ও কল্পনা-যোগে। যে অগোচর প্রক্রিয়ার বর্ণনায় বলা হয়েছে শাস্ত্রে — আদানে ক্ষিপ্রকারিতা চৈব প্রদানে চিরায়ুতা। গ্রহণ করবে নিমেষেই, প্রতিদানে যা দেবে সে হবে চিরস্থায়ী। ফলতঃ, অবনীন্দ্রনাথের আঁকা অধিকাংশ চিত্ররূপের বিশ্লেষনেই ধরা পড়ে তাঁর বস্তুরূপ সম্পর্কে আশ্চর্য দখল। ভাবব্যঞ্জনা অবশ্য বিশ্লেষণ করা যায় না, অনুভব করা যায় মাত্র। শিল্পীর সংকলিত উক্তি থেকে অনুমান করতে পারি, ধ্যানতন্ময় চিত্তে কিভাবে অনুভব করেছেন শিল্পী বিশ্বসংসার। সেই মুহূর্তে আর সেই স্থানেই নয় — কিভাবে দূরগত স্মৃতি আর তলিয়ে-যাওয়া অনুভূতি ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে আর-এক দিন শান্ত সমাহিত চিত্তে, ছবি হয়েছে, আর তিনি যদি গীতকবি হতেন গানও হোতো। দেখতে পাচ্ছি অবনীন্দ্রনাথের এই কর্মকৌশলে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য উভয়প্রকার জ্ঞান ও অনুভূতির, উভয়বিধ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির, সুন্দর একটি সমন্বয় হয়েছে। ছবিতেই তার সকল লক্ষণ ফুটে ওঠে নি কি? দেখা যাক্ অবনীন্দ্র-সৃষ্ট উৎকৃষ্ট চিত্ররূপে কী কী গুণ বর্তমান।—

প্রথমেই দেখি পাশ্চাত্যরীতির স্বভাবসংগত পরিপ্রেক্ষিত।

অনুকারী না হলেও, রূপের স্বাভাবিক সাদৃশ্য ও প্রমাণ।

প্রাচ্যচিত্ররীতি-সংগত রেখাও আছে, কিন্তু প্রায়শঃই তা গড়নের রেখা,৮ বাস্তব-ঘেঁষা মোগল-চিত্রে যার যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। আলংকারিক রেখা বা লেখাঙ্কনের রেখা নয়। এই রেখা মুছে দিলেও যেন রূপ হারিয়ে যেত না। বস্তুতঃ বিচিত্র বর্ণে দ্বন্দ্বে ও উজ্জ্বল অনুজ্জ্বলের বিবিধ পর্দায় রূপসমুদয় ফুটে উঠেছে, চোখের দেখার সঙ্গে মিল রেখে যে ভাবে ফুটে ওঠে বনেদী পাশ্চাত্য চিত্রকলায়।

কৃষ্ণলীলা এবং বিরল কতকগুলি ছবি বাদে, সচরাচর বর্ণবিলেপনে এই বিশেষত্বই দেখা যায় যে, রঙগুলি উজ্জ্বল অমিশ্র অথবা পর পর পৃথগ্ ভাবে বিন্যস্ত নয়। এদেশীয় লিপ্র বা টেম্পারা ছবিতে বর্ণসংগীতি - সৃজনের যে কৌশল দেখা যায় তাতে সম্পূর্ণ তৃপ্তি পান নি ব'লেই দেশী বিদেশী নানা রীতির মিশ্রণে শিল্পী উদ্ভাবন করেছেন ধোওয়াট রঙ ধরানোর নিজস্ব পদ্ধতি,৯ যেটিতে

৭ জোড়াসাঁকোর ধারে। 'শ্রুতিধরী' শ্রীমতী রানী চন্দের নিকটে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তাঁর এই শ্রুতিলিখন বা স্মৃতিলিখন বিহনে অবনীন্দ্রনাথের কথাতেই অবনীন্দ্রনাথকে বোঝাবার প্রয়ত্ন অনেকাংশেই অসম্ভব হয়ে পড়তো।

৮ জোড়াসাঁকোর ধারে। 'শ্রুতিধরী' শ্রীমতী রানী চন্দের নিকটে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তাঁর এই শ্রুতিলিখন বা স্মৃতিলিখন বিহনে অবনীন্দ্রনাথের কথাতেই অবনীন্দ্রনাথকে বোঝাবার প্রয়ত্ন অনেকাংশেই অসম্ভব হয়ে পড়তো।

৯ দ্রষ্টব্য শিল্পচর্চা গ্রন্থে : 'ওয়াশ' বা ধোওয়াট রঙের ছবি।

সুন্দরভাবে সমন্বিত হয়েছে তাঁর প্রাচ্য রুচি এবং পাশ্চাত্য চিত্রবিজ্ঞান — তারই ফলে মোলায়েম রঙের মীড়ে মূর্ছনায় এই জাতের চিত্রে রচিত হয়েছে সর্বদাই বিশেষ দেশকালের বিশেষ একটি আমেজ ও আবহাওয়া। এ দেশে এ জিনিস তো একেবারেই নূতন। অভিজাত পাশ্চাত্য রীতির সঙ্গেই এর মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমাদের জানা ছিল, প্রাচ্য চিত্রের বাহ্যতঃস্থির প্রসন্ন রূপকল্পনায় রেখাই সৃজন করে ছন্দ এবং সঞ্চার করে গতি। সচরাচর নন্দলালের চিত্রকৃতিতেও তা দেখা যায়; সেইখানেই তাঁর প্রাণবান্ নৈপুণ্য ও বিশেষ শক্তি। এ রেখা দেখা যায় না গুরু অবনীন্দ্রনাথের রচনায়, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। রেখানির্ভর বেগ ও ব্যঞ্জনার দায়িত্ব নিয়েছে এখানে রহস্যস্মিতমুখী বর্ণমায়া। অবর্ণনীয়ের আভাস বা আভা ফুটে উঠবে বর্ণে বর্ণে সে তো আশ্চর্য নয়। কেননা, আনন্দবিষাদ রাগদ্বেষের দুই-কূল-ছোঁওয়া মনের সকল ভাব অনুভূতি আলো-অন্ধকারের অসংখ্য পর্দার সমতানে বাঁধা; নিঃসাড় অচেতনায় চেতনার জাগরণ আর অন্ধকারে আলোকের ক্রমিক ফুটে ওঠা, একটি আর একটির তুলনা শুধু নয়, একই, ভিতরে আর বাইরে। তাই, যে ভাব ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না আলো-আঁধারের মীড়ে মূর্ছনায় স্বতঃই আভাসিত, প্রতিবিম্বিত। আলোক বিশ্লিষ্ট হয়েই অনন্ত বর্ণালি; মূলতঃ আলোকের যে শক্তি, যে গুণ, বর্ণেরও তাই। অনুভবী শিল্পীর তুলিকাপাতে একতান বর্ণের সমাবেশে তাই চিত্রের অপূর্ব ব্যঞ্জনা। কিন্তু, বেগ বা গতি? বলা ভালো, বেগ এ ক্ষেত্রে রূপে তেমন সঞ্চারিত হচ্ছে না যেমন রূপরসিকের চিত্তে। আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে বর্ণমায়ামুগ্ধ দ্রষ্টা। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে রঙের জাদুকর বললে কিছুমাত্র বেশি বলা হয় না। সেই রসনিষিক্ত রঞ্জনকে নিঃশব্দ পটে, নেত্রপ্রীতিকর এবং মর্মস্পর্শী নানা বর্ণের আশ্চর্য তানালাপ বললেও চলে।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনে কখনো বা অলংকরণ-ঘেঁষা প্রাচীন রীতিতে ছবি আঁকেন নি তা নয়, যখন রেখা ফুটে উঠেছে আর গড়ন লীন হয়ে গিয়েছে, বর্ণসমাবেশ হয়েছে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল এবং পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু যখন দেশকালের বিশেষ আবহাওয়ার মণ্ডলে, গড়ন নিয়ে, আপন চরিত্র নিয়ে, ফুটে উঠেছে বিশেষ একটি বস্তুরূপ, সেই সঙ্গে স্পর্শগম্য (আসলে চোখে দেখার অনুমান-গম্য) ত্বকের বিশেষত্বটিও ফুটে উঠেছে তার — টেক্‌শ্চার ব'লে যার অশেষ সমাদর য়ুরোপীয় চিত্রকলায়, আর মোগল-চিত্রেও যার তেমন অসদ্ভাব নেই। মনুষ্যত্বকের স্পর্শ স্বাদ শিহরণ যদি চোখে দেখেও অনুভবের বিষয় হয়, টেক্‌শ্চার নামে নির্দিষ্ট হয়, তবে অজন্তাগুহার কোনো কোনো ছবিতেও এর দর্শন পেয়েছি মনে পড়ে। রাজস্থানী এবং কাংড়া কলমের ছবিতে, পটে এবং পাটায়, এর কোনো সম্ভাবনা মাত্র নেই।

পশ্চিমদেশীয় শিল্পীদের মতো অবনীন্দ্রনাথ যেমন আগ্রহশীল ও কুশলী ছিলেন বিশেষ দেশকাল এবং আবহাওয়া-সৃজনে, বিশেষ চরিত্র-চিত্রণেও তাঁর কর্মকৌশল ছিল অতুলনীয়। যুগে যুগে তাবৎ ভারত-শিল্পীরা, মূর্তিকার এবং চিত্রকার, প্রধানতঃ বিচিত্র টাইপ সৃষ্টি করেই সন্তুষ্ট ছিলেন; যুগের প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ এসে প্রথম রচনা করলেন সার্থক প্রতিকৃতি। তাতে ভারতশিল্পের জাতিপাত হল না, অথচ য়ুরোপীয় শিল্পের অভিনব গুণাবলি আয়ত্ত এবং অঙ্গীকৃত হল। ফলতঃ অবনীন্দ্রনাথের অনেক ছবিতে অনেক মনুষ্যমুখই জানা-চেনা নরনারীর মুখাকৃতি বৈ নয় — রোমের প্রতিদ্বন্দ্বী[১০] যীশুখৃষ্টও শুনেছি ছিন্ন মলিন বসনে ফিরতেন কর্পোরেশন স্ট্রীট অঞ্চলে দৃপ্ত ধীর পদক্ষেপে; 'কথকঠাকুর' তো উৎকলদেশীয় ভাস্কর প্রৌঢ় গিরিধারী; আর উমা অথবা বসন্তসেনা, নূরজহান কিম্বা জেবুন্নিষা, এঁরা ছিলেন না শিল্পীর কন্যা ভগিনী অথবা বিশেষ কোন কুটুম্বিনী এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে না। কিট্টলেখনী-যোগে এবং জল-রঙের, কদাচিৎ তেল-রঙেরও তূলিতে, অপূর্ব প্রতিকৃতি এঁকেছেন শিল্পী অনেকগুলি। প্রতিকৃতি

অবনীন্দ্রনাথ ওয়াশের বিশেষ একটি ধরণে লিপ্ত ছবিরও ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন কয়েকবার — প্রথম দিকে 'ওমার খৈয়াম' কাব্যের ছবিগুলিতে, আর বিশেষভাবে শেষ দিকের 'আরব্য উপাখ্যান' চিত্রপর্যায়ে।

১০ ছবিখানির ইংরেজিতে নামকরণ হয়েছিল: Rival of Rome. অবশ্য, মাইকেল এঞ্জেলো 'রোজ কিয়ামৎ'এর ছবিতে খৃষ্টের যে রূপ এঁকেছেন, কেন জানি নে, সেটিও আমাদের মনে পড়ে।

ব'লে ঘোষণা নেই যে-সকল স্থলে, সেখানেও বহু বালবৃদ্ধ নরনারীর মুখাবয়বে নাম-মুছে-ফেলা প্রতিকৃতির অভাব নেই। সহস্রাধিক আরব্যরজনীর আখ্যান-কথনেও গগন অবন সমরেন্দ্র তিন ভাই ধরা দিয়েছেন কে না জানে — শিল্পীর বড় স্নেহের 'বাদশা' বা 'টোটো'-কেও খুঁজে পাওয়া যাবে না কি? মুখ ফিরিয়ে চলা বিশেষ থেকে অবিশেষের দিকে, ব্যক্তি থেকে 'জাতি'র দিকে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে — ভারতীয় মনোবৃত্তির ও ভারতের রূপরীতির এই সহজ প্রবণতা। এত দিনে তার একটি সার্থক ও সুন্দর ব্যতিক্রম দেখা গেল। এটিও যুগোপযোগী বিশেষ ঘটনাই বলতে হবে?

শিল্পী খেয়াল-খুশির বশে মুখ থেকে মুখোষের কল্পনা করেছিলেন অনেকগুলি — অবনীন্দ্রনাথ যে কত বড়ো প্রতিকৃতি-চিত্রকর ঐ মুখোষগুলিও তার অভ্রান্ত প্রমাণ। আসলকে খুব ভালোভাবে না জানলে তার এমন আশ্চর্য 'নকল' করা যায় না, অতিকৃতি উনকৃতি অথবা বিকৃতি সম্ভবপর হয় না।

জরায় এবং শোকে জড়োসড়ো বুড়ি, কদমকেশরের মতো এক-মাথা চুল, উদ্দেশ-হারানো চোখ দুটি যেন চোখের জলের সায়রে ভাসছে, হারা নাতির খেলনা ক'টি সামনে করে বসে আছে — এই ছবির অতিসাধারণ প্রতিচিত্র দেখেই একজন প্রবীণ জাপানি আর্টিষ্ট্ বলেছিলেন, 'নাম শুনি নি বটে। মনে হয়, ইনিই এশিয়া মহাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতিশিল্পী।'[১১]

প্রতিকৃতিরচনার বিশেষ প্রতিভা হল প্রতীচ্য জাতির। হয়তো মিথ্যা নয়, 'কৃষ্ণলীলা'র ছবিগুলি এঁকে শিল্পী পরিহার করলেন প্রাচ্যদেশীয় টিশিয়ান হওয়ার সযত্নপোষিত আশা।[১২] তবু আশ্চর্য এই যে, স্বাধীনভাবে পুষ্ট ও পরিণত হওয়ার পর, অবনীন্দ্র-প্রতিভার সুন্দর সৃষ্টিতে কখনো কখনো টিশিয়ানের কথাও মনে পড়ে। অর্থাৎ, সূক্ষ্মধূপছায়াময় গড়ন, রঙের মীড় ও মূর্ছনা, স্থানকালের ঘনীভূত আবহাওয়া, বস্তুগাত্রের কোমল-কঠিন রুক্ষ-মসৃণ নানারূপ স্পর্শ — এই গুণগুলির পরিস্ফুটনে সকল প্রকারেই নিগূঢ় মিল আছে উভয়ের মধ্যে। পার্থক্য আছে সন্দেহ নেই। মিডিয়াম বা উপকরণের পার্থক্যহেতুও একটির থেকে আর-একটি বিশেষ হয়েছে।

পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে দেওয়া নেওয়ার সকল প্রসঙ্গের পরে অবনীন্দ্র-সৃষ্টির এই গুণটিও স্মরণ করতে চাই যে, সেই রূপ স্বভাবতঃই সহজ, আর সহজ ব'লেই সুন্দর। প্রত্যেক সহজ সুন্দর সম্পূর্ণতার পিছনে রয়েছে কত তপস্যা না জানি, কিন্তু তার ভাবে ভঙ্গীতে ও প্রসাধনে আয়াসের বা ক্লিষ্টতার চিহ্নমাত্র নেই, মনে হয় না আর্টিষ্ট্ এ ছবি চেষ্টা করে এঁকেছেন — মনে হয়, ও যেন আপনি ফুটে উঠেছে কাগজে, কাপড়ে। একটি পাখির ওড়ার ব্যাপারে জটিল কত কল-কব্জার কত বিধিবিহিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকে; অথচ সে-সব কিছুই চোখে পড়ে না, মনেও ওঠে না, আকাশে বাতাসে অপূর্ব ছন্দে ঢেউ খেলিয়ে যায় শুধু সহজ সুষমা — এই দৃষ্টান্তে অবনীন্দ্রনাথ নিজে বুঝিয়েছেন উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টির সহজতা স্বাভাবিকতা। অবনীন্দ্রনাথের নিজের রূপসৃষ্টি সম্পর্কেও এ কথা সত্য। পরিপূর্ণ কলসের মতো যে মন, এতটুকু নাড়া পেলেই তার অক্ষয় রসানুভূতি ও রূপপ্রীতি ছল্‌কে পড়ে হয় — নৃত্য, গীত, কবিতা, মূর্তি, ছবি।[১৩]

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে সূক্ষ্মতা ও অলক্ষচারিতা যেমন আঙ্গিকে বা করণকৌশলে, তেমনি ভাবব্যক্তিতে বা রসের দিকে। ভাবব্যক্তির এই সূক্ষ্মতা, চারুতা, এই ব্যঞ্জনা — একেই বলা হয় তাঁর চিত্রের নিহিত কবিত্ব। নিঃশব্দে চোরের মতো রসিকের হৃদয়ে প্রবেশ করে, পরে কখন দেখা যায় মহিমান্বিত সম্রাটের মতো সিংহাসনে বসে আছে, অথবা অনুভব হয় শিশিরস্নিগ্ধ পেলব সুগন্ধি মালাগাছির মতো বুকে দুলছে।

মোটের উপর বলা চলে, এইগুলি অবনীন্দ্র-চিত্রকলার সর্বসামান্য গুণাবলি। যেখানে যতটা ব্যতিক্রম

১১ শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছে শোনা গল্প, তাঁরই অভিজ্ঞতার বিবরণ।

১২ বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির অবনীন্দ্রসংখ্যায়, শ্রীমুকুল দে'র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৩ শিল্পকথায় শ্রীনন্দলাল বসুর উক্তি।

দেখি তাতেও তার সাধারণ চরিত্র চাপা পড়ে না।[১৪]

কখনো ভাসা-ভাসা জ্ঞানে কেউ বলেছেন, সাহিত্যের প্রভাবে তাঁর শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ অন্যের-হাত-ফের্তা (সেকেণ্ড্-হ্যাণ্ড্) জগৎসংসার নিয়েই শিল্পী বুঝি কাজ সেরেছেন।[১৫] চিত্রাঙ্গদা স্বপ্ন-প্রয়াণ এবং বিম্ববতীর চিত্র-রচনাকালে শিক্ষানবীশ পথসন্ধানী শিল্পী সেই অবস্থায় ছিলেন বৈকি। পরে আর নয়। প্রতিভাবান্ শিল্পীর খেলাচ্ছলে যদি কোনো ব্যতিক্রম হয়ে থাকে কখনো, সে হল স্বতন্ত্র কথা।

যুক্তিশাস্ত্রে শুনতে পাই কার্যকারণের নানারূপ সম্বন্ধবিচার আছে। 'কলের গান' শুনব ব'লে আওয়াজ-বন্দী ঘূর্ণ্যমান চাক্তিতে পিন ছোঁওয়ানো হল, মনোজ্ঞ সুরে তালে লয়ে যে সঙ্গীত জেগে উঠল গ্রামোফোন পিন তার স্রষ্টা নয়। তুব্ড়ির মুখে জ্বলন্ত দেশলাই-কাঠি ঠেকাতেই তড়্বড়িয়ে অজস্র আগুনের ফুল-কাটা ফোয়ারা উঠে পড়ল আকাশে, সেও বুঝি আর-একরকম হেতু-পরিনাম। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ও প্রমাণে হাইড্রোজেন অক্সিজেন মিলিয়ে জলবিন্দুর সৃজন হল, সে ক্ষেত্রেও বায়বে আর জলে গুণ এবং কর্ম-গত তেমন কোনো মিল রইল না। কেনা কাপড় কেটে জামা তৈরি, পুরোনো বুটজুতো ছেঁটে চলনসই চটি-জুতো— সেখানেই একের কাছে অন্যের ঋণ, ঐ যাকে সাহেবী বাংলায় বলে, অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ পুরোনো কর্ণাটি বা হিন্দী গানের অনুরণনে গান বেঁধেছেন জানি, সর্বদাই তাতে রবীন্দ্র-প্রতিভার তুলনাতীত বিশিষ্টতার ছাপ আছে। অনেক সময় সূচনামাত্র পূর্ববর্তী গানের প্রভাবে, নইলে শেষ পর্যন্ত কোনো সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য 'ভেঙে' ছবি রচনাও[১৬] ঐ প্রকারই, অথবা ওর চেয়ে বিচিত্র। প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নূতন সৃষ্টি। তার প্রক্রিয়া শিল্পীর নিজের কাছেই রহস্যময়— রসিকের চোখে না হবে কেন? সেই স্বতঃসৃষ্টির সীমান্তে আছে ঐ সোনালি-রুপালি সন্ধ্যার পাখিটি যে হল বিজয়ার দিনে মায়ের কৈলাসে ফিরে যাওয়ার রূপ। মৌলিক প্রতিভার ক্ষেত্রে দেখতে পাই অজ্ঞেয় আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় কেবলই এক সৃষ্টির জিনিস অন্য সৃষ্টিতে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে—একেই বলতে পারি রূপান্তর। কদাচিৎ এ কথা বলবারও কারণ ঘটতে পারে: বিশ্বপ্রকৃতি যার পরিণাম, কবিতা মূর্তি চিত্রও তারই রূপ।

কখন কী এসে কবি বা শিল্পীর প্রতিভাকে সচেতন সক্রিয় করে তুলল কিছুই বলা চলে না। উদ্রেককারী বস্তুই যে কার্যভূত পরিণাম, অবনীন্দ্রনাথের ছবির বিচারে অন্তত সে কথা প্রায়ই সত্য নয়।

চোখের দেখা আর চিত্তের নিবিষ্ট উপলব্ধির স্থান নিতে পারে না মুখের কথা বা মুদ্রিত বাক্যাবলি। এ কথাও বলা হয়েছে, অবনীন্দ্রনাথের মূল চিত্র না দেখে অবনীন্দ্র-প্রতিভার ধারণা হতে পারে না। সে যাই হোক, আর-একটি বিষয়ের উল্লেখেই আমাদের এই আংশিক অপটু আলোচনা এবং অসাধ্যসাধনের চেষ্টা শেষ করা যাবে।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

তরুণ বয়সে এ কথা যখন উচ্চারণ করেছিলেন কবি,

১৪ একটি দৃষ্টান্ত দিলেই হবে। 'বঙ্গমাতা' (পরে নাম দেওয়া হয় 'ভারতমাতা') এরূপ একটি ব্যতিক্রম। এই ছবিতে গড়ন বিশেষ প্রাধান্য পায় নি, প্রত্যেকটি বর্ণ সমুজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যে ফুটে উঠেছে। রেখারও যথেষ্ট প্রাধান্য আছে। অথচ কাপড়ে, কেশে, পদতললীন ভূমণ্ডলে, দূরত্বসূচক পশ্চাৎপটে বা আকাশে, অবনীন্দ্র-চিত্রের অন্যান্য গুণেরও আভাস ইশারা দেখা যায় না এমন নয়।

১৫ ব্যাপার বরং তার বিপরীত। এ সম্পর্কে পূজনীয় শ্রীনন্দলাল বসু একটি গল্প বললেন। তাঁরা বাগগুহার ছবি নকল করতে গিয়েছেন। গুরু অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁদের মধ্যে সপ্তাহে কয়েকবার চিঠি-চলাচল হচ্ছে। একবার উল্লসিত হয়ে শিষ্য লিখলেন: রোজই নতুন নতুন রূপ ও কল্পনার আবিষ্কারে বিস্মিত হচ্ছি। তৎক্ষণাৎ গুরুর কাছ থেকে জবাব এল এই মর্মে: সুখের কথা! তোমার পিছনে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকেও দেখতে ভুলো না। পূজনীয় নন্দলাল বলেন: আমার চেতনা হল। জীবধাত্রী প্রকৃতির অনন্তরূপের কিছুটা পূর্বশিল্পীরা অঙ্কিত করেছেন, আমরাও কিছু করব। এই বিশ্বরূপ না দেখলে, কিছু দেখাই হল না।

১৬ রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই 'গান ভেঙে' গান রচনা করেন নি। আর, অবনীন্দ্রনাথ সর্বদাই যে 'সাহিত্য ভেঙে' ছবি করেছেন তাও নয়।

তিনি নিজেও জানতেন না, নূতন যুগের কী মহতী বাণী এই অতি প্রাচীন ভারতভূমিতে আদরে বরণ করে আনলেন। এ বাণী পাশ্চাত্যের। এ বাণীর সংগতি ও সংস্থিতি আছে ঔপনিষদিক বাণীতে, ঋষি যখন বলেছেন: জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। যে স্বর শাঙ্করভাষ্যে অশ্রুত ছিল বহুশতাব্দকাল। অবশ্য, অবনীন্দ্রনাথের মন নয় শ্রুতি-স্মৃতির আঁচল-ধরা। স্বভাবের শিশু অনায়াসে অন্তরে পেয়েছেন সংসার সম্পর্কে, বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে, সহজ সচ্ছন্দ অনুরাগ। যেখানে তিনি আর্টিষ্ট্, যেখানে কবি, সেখানে ঐটিই হয়ে উঠেছে অনাসক্ত অনুরাগ।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রসৃষ্টিতে তাই স্বভাবের স্থান, মানুষের স্থান, সব থেকে বেশি। তিনি জানতেন, আমরাও জানি, হিন্দু দেবদেবী, বুদ্ধ বা শিব, তেমন করে তাঁর মন ভোলাতে পারেন নি বা তূলিতে ধরা দেন নি। গঙ্গাবতরণের দৃশ্যে দেবদেবী, আনন্দে আত্মহারা শিব ও গণপতি, সকলেই আছেন সত্য— তাঁরা কিন্তু মানুষেরই রূপ। তুলনারহিত রূপে ও লাবণ্যে উদ্ভাসিত 'শিবসীমন্তিনী'ও শেষ স্পর্শটুকু মুছে ফেলেন নি মানবতার, তাই এত সুন্দর— চন্দ্রের শেষ কলাটি আছে যেমন ধ্যানমগ্ন শিবের জটাজালে, সে আর কিছুতেই পূরণ হয় না। রাজস্থানী অথবা কাংড়া কলমেও দেখা যায় ঐ একই ব্যাপার। শান্ত অন্তঃ-সমাহিত দেবদেবীর মূর্তি আছে এ দেশের ধাতুতে, প্রস্তরে, কখনো বা মৃন্ময়ী প্রতিমায়। অজন্তা-ভিত্তিচিত্রেও মানব বুদ্ধ বিরাজমান অতিমানব মহিমায়। ভারতশিল্পের এই সুস্থির ঐতিহ্যকেই এ কালে ধারণ করেছেন এবং নানাভাবে রূপান্তরিত করেছেন অবনীন্দ্র-শিষ্য নন্দলাল। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল আপন আপন প্রকৃতি ও প্রতিভার বশে বিভিন্ন পথে এগিয়ে গিয়ে পরস্পরের পরিপূরক হয়েছেন এবং এ কালের শিল্প-সংস্কৃতিতে অপরূপ-ঐশ্বর্য-শালী করেছেন— সে হল স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে যাই। অবনীন্দ্র-সৃষ্টিতে মানুষেরই প্রাধান্য, তাই অতীতে ও বর্তমানে, কল্পনায় ও প্রত্যক্ষে সচ্ছন্দ মেশামেশি। সহস্র রজনীর আরব্য উপাখ্যান, আজগুবি কথা, সেও অঘটন-ঘটানো কৌতুকা প্রতিভার হাতে পড়ে হোলো একান্তই মানবীয় রূপ-কথা। ব্যাপার এমনি যে, তাড়াতাড়ি গাছে চড়তে গিয়ে যে ছেলেটার পাজামার পিছন ছিঁড়েছে তুলি তাকে অচ্ছুৎ বলল না, তা ছাড়া আল্গোছে সম্ভব-অসম্ভবের বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ল কোলকাতা শহরের সাহেবী হোটেল হিঙ্কসের লণ্ঠন আর কার-ঠাকুর-কোং— কেউ বারণ করল না, কোথাও ছন্দোভঙ্গ হোলো না।

যেমন মধুসূদন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে তেমনি অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে (নন্দলালের শেষের দিকের বহু ছবিতে ও অজস্র স্কেচে) এই মানুষের রূপ, মানবিক স্পর্শ, মানবতার আস্বাদ— এটি হোলো এ যুগেরই জিনিস, এবং অভিনব। মোগল-চিত্রের প্রাণমূলেও এই প্রেরণাই ছিল। কিন্তু দেখা গেল, অন্তত অবসাদ-মুখী সমাজে ও সভ্যতায়' রাজা-বাদশার আদেশে বা আব্দারে, বাহিরের থেকে আনুকূল্য যতই হোক, ভিতরের দিকে নিগড়ে বাঁধে। সাম্না-সাম্নি অথবা মনে মনে মনিবকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে আর্ট হয় না, কবিতা হয় না— অন্তরে রসের উৎস শুকিয়ে যায় দুদিনে। এও দেখা গেছে, বহির্জগতের অনুকরণে অথবা অন্য জাতির রূপকৃতির অনুকরণ করেও আর্ট্ হয় না। কাজেই যুগের অভিপ্রায়কে সংসিদ্ধ করতে, জাতির শিল্পসংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সার্থক মিলন ঘটাতেও বটে, সেই প্রতিভাধর মানুষেরই পথ চেয়ে এসেছিল ইতিহাস যিনি হবেন একাধারে বাদশা এবং ফকির। সেই মানুষ অবনীন্দ্রনাথ। কখনো কখনো তাঁকে মোগল-রীতির শেষ শক্তিমান চিত্রকরও বলা হয়েছে। বর্তমান লেখকের জ্ঞান ও বুদ্ধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তবু না বলে উপায় নেই— শেষ নয়, অবনীন্দ্রনাথেই নূতন সূচনা। তার আশ্চর্য সম্ভাবনা দূর সুদূর শতাব্দকে অতিক্রম করে যাবে। কোলের কাছের সময়টুকুতে যদিবা বিভ্রান্তির ঝড় ওঠে অথবা রূপ-রঙ-মুছে-ফেলা নিবিড় কুয়াশা ঘনায়, তবু স্থায়ী হবে না কিছুই, আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে যথাকালে— এই বিশ্বাসই থাক্।

চীনা-জাপানীদের ধারণা এই যে, পাঁচ শত বৎসরে

একটি প্রতিভার বিকাশ হওয়াই যথেষ্ট। এ কথায় হয়তো অত্যুক্তি রয়েছে, হয়তো এক প্রতিভার ধারা অন্য শত জন শত দিকে প্রবাহিত করে দিত ওঁদের দেশে আর ওঁদের কালে — সে সম্ভাবনা আজ নেই। তবু, এদেশীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে-যে যুগপৎ দুটি বিস্ময়কর প্রতিভার বিকাশ হয়েছে এই বিংশ শতকে, এতেও কি আশার কথা নেই? এমন অহেতু পরাজয়েচ্ছু চিত্ত-দৌর্বল্যকে কোনোক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আর কিছু বলতে চাই নে। সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও অন্যে আলোচনা করুন্। ব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয় সম্পর্কেও একটু ছুঁয়ে গেছি মাত্র। অধিক আলোচনা করি তার শক্তি বা সুযোগ কোথায়? অথচ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ একটি অনন্য ষ্টাইলের স্রষ্টা — আর, ষ্টাইল বলতেই সেই জিনিস যা স্রষ্টার ব্যক্তিসত্তার দ্বারা ওতপ্রোত। অবনীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই শিশু, নট এবং কবি; তেমনি আর-একটি পরিচয় তাঁর এই যে, নিজের সৃষ্টিকে তিনি প্রতি পদেই অতিক্রম করতে চেয়েছেন। তাই এত বৈচিত্র্য যা রূপরসিকমাত্রেই চোখে ধরা পড়বে, তাই এক দৈবী অতৃপ্তি যা তিনি আলাপে ও বাগেশ্বরী বক্তৃতায় বার বার ব্যক্ত করেছেন। সেই চিরসন্ধানের চিরঅসন্তোষ স্মরণ ক'রেই আধুনিক কোনো কবি তাঁর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

প্রাণের বাহিরে এই অনিন্দ্য আলোকে
মূর্তিমন্ত করিলাম যত প্রাণনিধি,
[আবেগগদ্গদ হায় হৃদি]
বাগর্থমণ্ডিত করি গীতিমূর্ছনায়
স্বপ্ন সাধ অনুরাগ যত কেন সাধিলাম হায়,
রয়ে গেল চিরন্তন রূপের আকৃতি—
মর্মে মর্মরিত চির বোবা-অনুভূতি—
প্রাণ ভরে নিয়ে যাব এই।

অথবা—

যে ভাষা দিয়েছি, আজও, কিছু হয় নাই।
কী রূপ রচিনু, ছাই,
প্রাণ-অনুরাগে।[১৭]

এই চির-অসন্তোষ (গোপন ক'রে লাভ কী) এটিও চিরচলিষ্ণু, প্রাণবান, বেগবান পাশ্চাত্য সভ্যতারই বিশেষ লক্ষণ। কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথেও দেখা যায়। বেদে 'চরৈবেতি' 'চরৈবেতি' মন্ত্র-আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে সত্য; অর্থ একই, সুরের একটু পার্থক্য তবু কানে লাগে। জানি না অশীতিবর্ষের দেউড়ির কাছে এসে চিরচঞ্চল প্রাণের চিরন্তন আবেগ শান্ত হয়েছিল কিনা।

শিল্পী নিজের পরিণত প্রতিভার নানা গুণ একত্র সংহত করে আরব্য উপাখ্যানের ছবি এঁকেছিলেন জানি। তার পর চণ্ডীমঙ্গল এবং কৃষ্ণমঙ্গল আলেখ্য-মালা — আরও কিছু কিছু ছবি যা অল্প লোকেই দেখেছেন। এগুলি সবই খেলাচ্ছলে আঁকা। অথবা এ-সব ক্ষেত্রে 'ছবি আঁকা' না ব'লে 'ছবি লেখা' বলাই হয়তো ঠিক। বেজেছে সরল বাঁশির সুর, শততার যন্ত্রে সমৃদ্ধ রাগ-রাগিণীর আলাপন নয়। কিন্তু, সারা জীবনের সাধনা ও সিদ্ধি আছে পিছনে, তাই সহজেই সুন্দর হয়েছে এবং এতটুকু ইঙ্গিতেও অনেক কথাই বলা চলেছে।

চিত্ররচনার পালা শেষ ক'রে, ফেলা-ছড়া কাঠ-কুটো ন্যাকড়া-চট নুড়ি-পেরেক খুঁজে-পেতে এক-মনে কাটুম-কুটুম বানিয়ে একা-খেলায় মেতেছিলেন শিল্পী শেষ বয়সে। (আসলে, রসোত্তীর্ণ শিল্প মাত্রই একার সঙ্গে একাকীর খেলা, পরে প্রসাদ পায় অথবা ভোগ করে অন্য দশজন।) আরাম-কেদারাটিতে ব'সে, রঙতুলি-যোগে ও একাগ্র মনোযোগে বিশ্বভুবন নিয়ে দেখা-দেখা খেলা দূরে থাক্, বরানগরের বাগানে ঘুরে ফিরে একটু দেখবেন, এটা ওটা কুড়ুবেন, অবশেষে সে ক্ষমতাও ছিল না। সেইটেই বড়ো দুঃখ দিয়েছিল চিরশিশুর প্রাণে, এ কথা মনে পড়ে।

মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পরে, আচার্য-রূপে অবনীন্দ্রনাথ এসেছিলেন শান্তিনিকেতন-আশ্রমে। ভিড় জমে যেত তাঁকে নিয়ে আম্রকুঞ্জে, ঘণ্টাতলায়, উত্তরায়ণে আর কলাভবনের প্রাঙ্গণে ও ঘরে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে ঝরে চলেছে অশ্রান্ত রসনির্ঝর। কত তত্ত্ব, কত কবিত্ব, কত কাহিনী। অনেক কথার মধ্যে আভাসে মনে রয়েছে শিল্পী বলেছিলেন, তাঁর স্নেহময়ী জননীর তিন-মহলা বাড়ি। বার-বাড়িতে কেবল দাস দাসী, লোক-লস্কর, গাড়ি-জুড়ি, লেন-দেন কাজ-কর্ম হিসাব-বেহিসাব তাড়াহুড়া নিয়ে রাতদিন হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড কারখানা। তলে তলে শৃঙ্খলা অবশ্য আছে। আটের যা-কিছু উপায়-উপকরণ রীতি-পদ্ধতি নিয়ে ঝাড়াই-বাছাই চলছে অবিরত। জীবন-ভোর এখ'নকারই চাকরি বা কুলিগিরি ক'রে কেউ কেউ কাটালো। এর পরে হল বৈঠকখানা। সেখানে সাজানো-গোছানো রাজৈশ্বর্য, রাজ-মছলন্দ, ঝাড়-লণ্ঠনে নানা রঙের আলোর ঝল্‌মলানি, জ্ঞানী গুণী রসিক ও শৌখিন সজ্জনের আনাগোনা, নাচ-গান, আনন্দ-উৎসব — কারও ইচ্ছা হয় না 'এখান থেকে উঠি', কারও মনে হয় না এ-সব ছেড়ে আরও কিছু চাওয়া যায় বা পাওয়া যাবে। ভিতর-মহল একটি কিন্তু আছে, মায়ের অন্দর-মহল। সেখানে লোক-দেখানো ঐশ্বর্য কিছু নেই, ভিড় নেই। গড়ের বাদ্য তো নেই-ই, পিয়ানোর টুংটাং পর্যন্ত শোনা যায় না — অলক্ষ্য পাখির কাকলি শুধু, ঝিল্লির অতি মিহিন সুর। মুঠো মুঠো আলোর ফুল ছড়িয়ে কে যে কৌতুক করে সন্ধ্যারাত্রে, তাই জলে নেভে জোনাকির পাঁতি। মা, আর মায়ের দুলাল, শুধু দুজনের খেলার জায়গা সেই। হঠাৎ দেখি সেখানে—

হেসে হেসে চাঁদ জেগেছে,
দুলতে দুলতে বান এসেছে।
জলে কত চাঁদ ভেসেছে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে চাঁদ হেসেছে।
সোনার বরন সোনার চাঁদ,
আ — হা, কুড়িয়ে পেলে কে?
না,
অনেক ভাগ্য যার।.....

দীর্ঘজীবনব্যাপী শিল্পসাধনার শেষে, মায়ের এই অন্দরমহলে, মা ও মাতৃদুলালের মিলিত এই খেলাঘরে, অবনীন্দ্রনাথ পৌঁছুতে চেয়েছিলেন জানি, হয় তো পৌঁছেও ছিলেন। সেখানে আমাদের প্রবেশ নেই।

১৭ 'উর্বশী' কাব্যগ্রন্থে: শিল্পীর সন্ধ্যা।

টুসু

ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়
বিভিন্ন জাতি-উপজাতির সংস্কৃতি সম্পর্কে নানা পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন। অধুনা অধ্যাপনা-কর্মে লিপ্ত।

থালার উপর বসানো মাটির পুতুল টুসু।

টুসু ও তোষলা।

টুসু মানভূমের একটি লোক উৎসব। অবিভক্ত মানভূম, সিংহভূম, ধলভূম ও রাঁচীর কিছুটা নিয়ে উৎসবভূমির পরিধি। এই পরিধিচক্রের সন্নিকটভূমি, বাঁকুড়ার পশ্চিম সীমাঞ্চল, মেদিনীপুর এমন কি খড়্গপুর পর্যন্ত ভূ-সীমা টুসু উৎসবের রেশটি আত্মসাৎ কোরেছে। প্রচলনের ব্যাপকত্ব, জনপ্রিয়তা ও লোক-জীবনের সহিত পরিচিতির নিবিড়তা দেখে মনে হয় উৎসবটির উদ্ভব ঘোটেছে মানভূমেরই কোনও অঞ্চলে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের অনুমাননির্ভর উক্তি "মানভূমে ইহার প্রচলনের ব্যাপকতা দেখিয়া মনে হয় যে মানভূম হইতেই ইহা পশ্চিম বাংলায় আসিয়া একটি স্থানীয় রূপলাভ করিয়াছে" বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলাদেশের তোষলা বা তুঁষ-তুষলি ব্রতটি টুসু উৎসবের ব্রতরূপ ছাড়া কিছু নয়। অনেকে মনে করেন বঙ্গভূমির তোষলা ব্রতটিই মানভূমের মৃত্তিকায় টুসু হোয়েছে। এ-সম্বন্ধে কোনও কোনও গবেষক তুঁষ, তুষুলি, তুষু, টুসু-সব একাকার কোরেছেন এবং স্ব-মত সমর্থনে নিম্নরূপ যুক্তির অবতারনা কোরেছেন। প্রথম যুক্তি : গানের প্রাক্‌যুগে ছড়ার উদ্ভব। তুঁষ-তুষলি ব্রত ছড়ায় বিধৃত, টুসু গানে। তাই তুঁষ-তুষলির চরণচিহ্ন ধোরে টুসুর আবির্ভাব।

দ্বিতীয় যুক্তিটি শব্দতত্ত্বের। তোষলা বা তুঁষ-তুষলি শব্দের সঙ্গে টুসু কথাটির শব্দ সাদৃশ্য রোয়েছে। এ থেকে শব্দবিবর্তন পথে তুঁষ-তুষলি টুসু হোয়েছে অনুমেয়। এবং এরা সকলে 'তুষপালিকা' শব্দের গর্ভজাত। "The group of words Tus, Tusuli and Tusu or Tusuli have fallen down from = Tusali = Tusalia = Tusapalika." যুক্তি দুটি অসার্থক ও ভ্রান্তিপুর্ণ।

আদিম জাতির মনে প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়, যেমন নদী, পাখির কলরব, বাতাসের ঝিরঝির শব্দ, শুকপাতার মর্মরধ্বনি, একটি সুরের উদ্বোধন কোরেছিল। এই সুরের বাঙ্ময় প্রকাশ—ছড়া। এর অনেক পরে এসেছে গান। ছড়া অনার্যদের নাচ ও গানের তালের সগোত্র। আদি ছড়াটি আদি গানের চেয়ে বৃদ্ধ স্বীকার কোরলেও একথা অযৌক্তিক যে সমস্ত ছড়াই সমস্ত গানের চেয়ে প্রাচীন। তুঁষ-তুষলীর ছড়া ও টুসুগানের জন্ম-তারিখ আমাদের অজানা। তাই তোষলার ছড়াগুলি যে

টুসুগানের প্রাক্‌পর্যায় তা বলা যায় না। বিশেষকোরে টুসু উৎসবে গান ছাড়া যখন ছড়াও প্রচুর পাওয়া গেছে তখন একথা বলাই যুক্তিযুক্ত যে টুসুর ছড়াগুলিই টুসু গানের প্রাক্‌-যুগের স্মারক, তোষলা ব্রতের ছড়াগুলি নয়। তুষ-তুষলি, তোষলা, তুসু ও টুসু এক বস্তু নয়। তোষলাব্রত ও টুসু উৎসবের প্রকৃতিগত বিভেদের মত ব্রত ও উৎসবের ছড়াগুলির জাতিও আলাদা। উৎসবের ছড়া ও ব্রতের ছড়ায় প্রকৃতিগত ও বিষয়গত পার্থক্য স্ফুটমান। টুসুর ছড়াগুলির সঙ্গে টুসুগানের যোগটি লোকজীবনের বিবর্তনের সূত্রটি ধোরে গ্রথিত। সেখানে তোষলার ছড়াগুলি ব্রাত্য। সমস্ত উৎসবভূমিতে টুসুর ছড়া বিষয়বৈচিত্রে ও বর্ণসজ্জায় অতুলনীয়, অজস্রতায় মহৎ অথচ তোষলা-ব্রতভূমিতে তোষলা ছড়ার বিষয় ও রূপসজ্জা সর্বত্র এক এবং অপরিবর্তনীয়।

তুষপালিকা থেকে তুসু প্রভৃতির আগমন-পর্যায় যেভাবে দেখানো হোয়েছে, তা ব্যাকরণমতে সিদ্ধ। কিন্তু টুসুকেও তুষপালিকা পর্যন্ত টেনে নেওয়া যায়। তুষ শব্দের প্রচলন বাংলায় বহুল এবং তোষলাব্রতে তুষ'এর ব্যবহার অবারণীয়। কিন্তু টুসু শব্দটি অপরিচিত এবং বাংলাভাষায় এর কোনো অর্থবেদ্যতা নেই। সুতরাং তুষপালিকা থেকে যে বিবর্তন দেখানো হোয়েছে তাই সত্য মেনে নিয়ে টুসুও যে একই মাতৃগর্ভজাত একথা বহুজন স্বীকার্য তথ্য হোয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু তথ্যটি সন্দেহাতীত নয়। কারণ লৌকিক ব্রত ও দেবতা-উপচারে এমন কতকগুলি বস্তু প্রায়ই ব্যবহৃত হয় যার মূল মৌল-বস্তুতে অনুপস্থিত। যেমন ধর্ম-পুজোয় চুণের ব্যবহার। বৌদ্ধ ত্রিশরণ মন্ত্রের 'সঙ্ঘ' শব্দটি 'শঙ্খে' পরিণতি পেয়েছিল, তারপর শঙ্খ থেকে তার ধবলীবর্ণ, শঙ্খচূর্ণ প্রভৃতির পথ দিয়ে ধর্মপুজোয় চূর্ণএর আবির্ভাব ঘোটলো। টুসুতে তুষএর ব্যবহার নেই। টুসু যখন ব্রতভূমিতে তুষ-তুষলিতে রূপান্তরিত হোলো এবং তুষ যখন বাংলারজীবনের সঙ্গে পরিচিত একটি এমন বস্তু যার অর্থবেদ্যতা টুসু উৎসবের ভাবার্থ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, তখন টুসু শব্দের রূপভেদী তুষ-তুষলি ব্রতে তুষের আবির্ভাব ঘোটলো। ক্রমে নবাগত তুষএর প্রাধান্য দিয়েই তোষলার পরিচয় আরম্ভ হোলো। এমন ধারণাই সঙ্গত।

একটি সূত্রের প্রতিষ্ঠা।

অতঃপর টুসু উৎসব ও তোষলা ব্রতের প্রকৃতি বিচারে উপরোক্ত বিতর্কের কোন্ কিনারায় তরী ভেড়ে দেখা যাক।

"আমাদের দেশে দু-রকমের ব্রত চলিত রোয়েছে দেখা যায়। কতকগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত, আর কতকগুলি শাস্ত্রে যাকে বলছে যোষিৎপ্রচলিত বা মেয়েলি ব্রত। এই মেয়েলি ব্রতেরও দুটো ভাগ ; একপ্রস্থ ব্রত কুমারী ব্রত—পাঁচ ছয় থেকে আট নয় বছরের মেয়েরা এগুলি করে, আর বাকিগুলি নারী ব্রত—বড় মেয়েরা বিয়ের পর থেকে এগুলি কোরতে আরম্ভ করে। ...পুরানের দেবদেবীদের উৎপত্তির ইতিহাস আদান প্রদানের ইতিহাস ; ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই ; কেবল এই মেয়েলি ব্রতগুলির মধ্য দিয়ে আমরা সেই সব দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ি, যেখানে আমাদের পুর্বতন পুরুষ অন্যব্রতরা তাঁদের ঘরের মধ্যে রোয়েছেন দেখি। ...হিন্দুধর্মের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে লৌকিক ব্রতের চেহারা এমন অদল-বদল হোয়ে গিয়েছে যে, এখন যে ব্রতগুলি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তা অতি অল্প এবং দু-চারিটি ছাড়া সেগুলিও খণ্ড অসম্পূর্ণ অবস্থায় আমরা পাই।" ব্রত সম্বন্ধে এই ভূমিকার পর অবনীন্দ্রনাথ তোষলা ব্রত উপলক্ষে বোলেছেন "কিন্তু যে ব্রতগুলি ছোট এবং অপ্রধান বোলে শাস্ত্রের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে অনেকটা আঁট অবস্থায় রোয়ে গিয়েছে তার থেকে ব্রতের খাঁটি ও নিখুঁত চেহারাটি পাওয়া সহজ। যেমন এই তোষলা ব্রত। কোথাও একে বলে তুঁষ-তুষলি। পূর্ববঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে দু-জায়গায়ই এই ব্রতের চলন আছে।

প্রতিদিন পৌষমাসের সকালে মেয়েরা এই ব্রতটি করে। ব্রতের বিধি এই : অঘ্রানের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি সকালে স্নান কোরে গোবরের দু-বুড়ি দু-গণ্ডা বা ১৪৪টি গুটি পাকিয়ে কালো দাগশূণ্য নতুন সরাতে বেগুন পাতা বিছিয়ে তার উপরে গুটি কটি রাখতে হয়। প্রত্যেক গুটিতে

একটি কোরে সিঁদুরের ফোঁটা এবং পাঁচগাছি কোরে দুর্বোঘাস গুঁজে দিতে হয়। তার উপর নতুন আলো-চালের তুঁষ বা কুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে সরষে, শিম, মুলো ইত্যাদির ফুল দিয়ে ছড়া বলা হয়।"

টুসু বয়স নির্বিশেষে মেয়েদের উৎসব। এই উৎসবে ছেলেদেরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কুমারী বা নারীব্রত কোনটির মধ্যেই টুসু বাঁধা পড়ে না, এ উৎসবে উভয়ের সমান ভূমিকা। আদিম সমাজের নগ্নতা তার সকল দোষগুণ নিয়েই টুসু উৎসবে উপস্থিত। তোষলার শুদ্ধাচার পবিত্রতা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি টুসুতে নেই। এই উৎসবানুষ্ঠানে মার্জিত মনের ছাপ পড়ে নি। তোষলা ব্রতের মত সরা ও গোবরের গুটি টুসুর দু-একটি রূপায়ণে ব্যবহৃত হোলেও তুঁষ বা কুঁড়োর চিহ্নমাত্রও এতে নেই, বেগুনপাতা, সিম-মুলো ফুলের প্রচলন টুসুতে অনুপস্থিত। অথচ উৎসব-ভূমিতে এই সব কটি উপাদান প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। টুসুর ছড়ার প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে বিস্মিত হোতে হয়। তোষলার ছড়াগুলির একটি বিশেষরূপ আছে, সেগুলি অনিবার্য ভাবে ব্রতের ছড়া, এই বাঁধা ছড়ার বাহিরে তোষলার অন্যকোন ছড়ার পরিচয় আমরা জানি না। টুসুর ছড়াগুলি লোক-জীবনের নিত্যনব অভিজ্ঞতা থেকে উদ্বুদ্ধ হোয়েছে বোলে বর্ণাঢ্যতায় এগুলি অনবদ্য। লোকজীবনের সঙ্গে এই ছড়াগুলি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংপৃক্ত। তোষলা সকাল-বেলায় উদ্‌যাপ্য, টুসু সন্ধ্যাবেলায় প্রতিদিন গানের মধ্যে জাগে, গানের মধ্যে ঘুমোয়ে।

এই তুলনামূলক আলোচনায় টুসু ও তোষলার বহিরঙ্গের পার্থক্য-প্রত্যয় সাধিত হবে। অনন্তর সমাজজীবনের অন্তরঙ্গ আলোচনায় দেখতে পাওয়া যাবে এই পার্থক্য স্ফুটতর হোয়েছে এবং টুসু উৎসবটির রূপানুগ ছবিতে আদিমজীবনের হৃদস্পন্দন ছন্দে ছন্দে লীলায়িত রোয়েছে। টুসু কৃষি-সভ্যতার যুগস্মারক।

"হামদের টুসু হাল বাহে ডাইনে-বাঁয়ে লাল গরু।
বাছে বাছে কামিন করবো দাঁত কাল কাঁকাল সরু॥"

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় কৃষি-সভ্যতার আদিযুগে নারীই কৃষির কাজ কোরতো। পুরুষ তখনও বনের নিভৃতে পশু শিকার ছাড়েনি। "Agriculture is at first women's work, and it is only by degrees that men come into it." সুতরাং কৃষি সভ্যতার মূলে নারীর অবদান ও প্রাধান্য অবশ্যস্বীকার্য। উৎসবভূমির বিস্তৃত অঞ্চলে নারীরই প্রাধান্য রোয়েছে। ইচ্ছামত বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পরে নতুন পতির সহিত বাসা বাঁধায় এদের সমাজে নারীর পাতিত্য ঘটে না। উদ্দাম নারীজীবনের নগ্নরূপটি টুসু উৎসবে উচ্ছল হোয়ে দেখা দেয়। টুসুর গানে গানে, যে গান মা, মেয়ে, বউ, দিদিমা-ঠাকুমা একই সঙ্গে পুরুষ দলকে লক্ষ্য কোরে গায়, যৌন-জিজ্ঞাসা কামনার তৃপ্তি ও অতৃপ্তিমূলক দেহ-সম্ভোগের যে ছবি

চিত্রিত হয় তা অতি আদিম, নগ্ন ও অনভ্যস্ত শ্রুতিতে নিতান্তই অশ্লীল। যৌনমিলনের সম্মতি-সঙ্কেত-রূপ পানের ব্যবহার এই সমাজের একটি প্রাচীন প্রথা। টুসুগানেও তার পরিচয় পাই।

"হামদের টুসু গরু চরায় বাবু বাঁধের কিনারে।
আঁখিঠারে বলে দিব পানের খিলি সাজাতে॥"

মিলিত কণ্ঠের টুসু গানগুলি দলগত বিবাহ ও যুবক যুবতীর মিলনের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি লাঞ্ছিত। টুসু ভাসানের দিন নদী-তীরে যাত্রীদল স্ত্রী পুরুষের শোভা-যাত্রার মিলিত কণ্ঠের গানগুলি ও গানানুসারী অঙ্গভঙ্গী-গুলি পীড়নাত্মক যৌনতৃপ্তি এবং উপসর্পণার (courtship) অভিব্যক্তি ছাড়া কিছু নয়। "courtship is a play, a game ; but the process behind it is one of terrible earnestness, and the play at any moment become deadly" একথা টুসু শোভাযাত্রী উৎসব মত্ত নর-নারীগুলিকে দেখলেই বোঝা যায়। অনভ্যস্ত মানুষ এগুলিকে অশ্লীল আখ্যা দেবে। এই গানগুলি উদ্ধৃত কোরলে প্রবন্ধ হিসাবে পরিপূর্ণতার চিত্র দিতে পারা যেতো কিন্তু উদ্ধৃতি অ-নিরাপদ বিবেচনায় সংযত হওয়া গেলো। প্রাচীন গ্রীসের দিওনিসাস্ পুজোর শোভাযাত্রার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে।

টুসু উৎসবে আদিম জীবন ধারাটি লক্ষ্যনীয় অথচ তোষলার অন্তর্নিহিত সত্যটি শুদ্ধাচারের, শালীনতার। ব্রতের সঙ্গে স্তুতি কামনা ও দেবতার ভাব-রূপ ছড়িয়ে আছে। মানুষের আদিম জীবনে এমনটি সম্ভব নয়। ব্রত মানবসমাজের যে কোটিতে প্রচলিত তারা নিশ্চয় আদিম স্তরের অনেক উপরে স্থিত মার্জিত জন-মানসের দ্যুতিতে বিভাসিত। তোষলা ব্রতে তাই উচ্চকোটির মনন চিহ্ন এবং টুসু উৎসবে নিম্নকোটির মানসিক রূপায়ণ অনিবারনীয়তায় সিদ্ধ হোয়েছে। উচ্চকোটির কোনো একটি ব্রতকে নিম্নকোটির মানুষ নিজেদের লোক উৎসবের রূপ দেবে এমন ভাবা যায় না। লোক উৎসবে মূল জাতির অন্তরের মধ্যে নিহিত। বহিরাগত একটি ব্রত একটি জাতির মানসিক চর্চার সোপান হোতে পারে কিন্তু জীবনের ভিত্তি হোতে পারে না। উৎসব ভূমির নিম্নকোটি মানুষের রক্তের সঙ্গে টুসু উৎসব যেন যুগ যুগান্তর থেকে মিশে আছে, উৎসব দিনগুলিতে সে-কথা, যে একবার উৎসব দেখেছে সে কিছুতেই অস্বীকার কোরতে পারবে না। তোষলা ব্রত টুসুর উৎস হোলে টুসু একটি ব্রত হোতো, কুমারী বা নারী-ব্রত অর্থাৎ নিম্নকোটির মানবসমাজে উচ্চকোটির মননবৃত্তির ছায়া পড়তো। সে ছায়া অনুপস্থিত অথচ টুসু যদি তোষলার রূপায়ণ হোতো তবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অনুচিত নয় যে, নিম্নকোটির লোক উৎসবটি উচ্চকোটির মানুষ গ্রহণ কোরেছে, তারপর মানসিক স্তর উচ্চতার জন্য ব্রতাকারে এর রূপায়ণ কোরছে। টুসুর মধ্যে অন্যব্রতদের হৃদ্‌স্পন্দন শুনি। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন "মেয়েলি ব্রত মাত্রই অন্যব্রতদের কাছ থেকে নেওয়া।" এক্ষেত্রে তাই তোষলা থেকে টুসু নয়, টুসু থেকে তোষলার রূপায়ণ-তথ্যই প্রমানিত হয়।

অনেকে বোলবেন, স্ব স্ব ক্ষেত্রে তোষলা ও টুসু মূলতঃ পৃথক কিন্তু ব্রতভূমি ও উৎসবভূমির নৈকট্যহেতু এসে অপরের প্রভাবে অন্ততঃ কিছুটা অবশ্যই প্রভাবিত। বিষয়টি বিচার্য। বাঙলার সীমা ইতিহাসে দেখি এর প্রসারণ ও সংকোচনের অনেকগুলি অধ্যায় আছে। 'বাঙালীর ইতিহাস'এ দেশ পরিচয় অধ্যায়ে বৃহৎ বাংলার পশ্চিম সীমা আলোচনায় বলা হোয়েছে, "বাঁকুড়ার পশ্চিম-সীমায় মানভূম জিলা বর্তমান বিহারের অন্তর্গত। অথচ এই মানভূম প্রাচীন মল্লভূমি—মানভূমেরই অন্তর্গত। বাঁকুড়া ও মানভূমের ভিতর কোনও প্রাকৃতিক সীমা নেই ; সেই সীমা মানভূম অতিক্রম কোরে একেবারে ছোট-নাগপুরের শৈলশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই শৈলশ্রেণীই এই দিকে প্রাচীন বাঙালার সীমা।" সুতরাং বলা চলে ব্রতভূমি ও উৎসব ভূমির ভিতর কোন প্রাকৃতিক সীমা না থাকায়, পরস্পরের প্রভাব প্রতিপত্তনে অসুবিধা ঘটেনি। কিন্তু স্মরণীয় যে বাঁকুড়া ও তত্রস্থ অঞ্চলে যখন জনপদবাসীর জীবনরোল বেজেছিল তখন উৎসবভূমি নিবিড় অরণ্যে অতন্দ্র দিনরাত্রির প্রহর গুনতো। বিগত সাঁওতাল বিদ্রোহের পর প্রত্যন্ত প্রদেশের ঘনবনগুলির ডালপালা কাটা হোয়েছে ও সূর্যালোক অরণ্যস্মৃতিকা চুম্বন কোরেছে, আরণ্যক জীবন রবিরশ্মিতে অভিসিঞ্চিত

উৎসবে অংশগ্রহণকারী দল।

হোয়েছে। তাই ব্রতভূমির প্রভাব এত অল্পদিনে বিস্তৃত উৎসবভূমির মর্মে মর্মে অনুবিদ্ধ হোয়েছে ভাবতে সংকোচ হয়। ইতিহাস পাঠে একথা জানা যায় যে, কালযাত্রা পথে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে। মৃত্তিকার স্তর পর্যায় যেমন একটি ছুটি কোরে বহুসংখ্যায় ভূগর্ভের নিম্নতল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তেমনি 'কালচার-রিজিয়ন' (culture-region) এ সংস্কৃতির রূপান্তরের প্রতিটি স্তরের পরিচয় বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকে। 'কালচার-রিজিয়ন'এর পার্শ্ববর্তী ভূভাগে এই বহুস্তরময় সংস্কৃতির যে কোনো একটি রূপ প্রাধান্য পায়। টুসু-উৎসব ভূমিতে টুসু রূপান্তরের বহু পর্যায় খুঁজে পাওয়া গেছে; ব্রতভূমিতে তোষলা-ব্রতের বহুস্তরবিধায়িনী শক্তির সম্পূর্ণ অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। তাই একথা ভাবা অযৌক্তিক নয় যে টুসু-'কালচার-রীজিয়ন্'এর কোনো একটি স্তর বিক্ষিপ্ত হোয়ে পশ্চিম বাংলায় নূতন রূপায়ণ যখন পেলো তখন তাই তোষলা-নামে কালক্রমে পরিচিত হোলো।

টুসু উৎসব ও তোষলা ব্রতের ভাবগত সাদৃশ্য অনস্বীকার্য। তোষলা ব্রত সম্বন্ধে বলা হোয়েছে "ব্রতের নাম এবং উপকরণগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এটি সারমাটি দিয়ে ক্ষেত উর্বর কোরে তোলবার ব্রত।" টুসু সম্বন্ধেও একথা বলা চলে এবং অনতিপরেই সেকথা আলোচিত হবে। পৃথিবীর অবলুপ্ত ও বর্তমান বহু উৎসবের সঙ্গে সারমাটি দিয়ে ক্ষেত উর্বর কোরে তোলবার ভাবটি দেখতে পাই। উদাহরণ দিতে উর্বরা শক্তি-উপাসনার আলোচনার দুয়ারে বহু উৎসবেরই নাম করা যায়। বাংলাদেশের লক্ষ্মীব্রত, মেক্সিকো, পেরু, প্রভৃতির 'centeott', 'xilonen' প্রভৃতি দেবীর দল এই পর্যায়ভুক্ত। এই সঙ্গে এথেন্সের 'এলিউসিনিঅ' উৎসব এথেন্স ও গ্রীসের থেসমোফোরিঅ উৎসবের নামও স্মরণ চিহ্নিত হয়। একই সূত্রে দেমেতের নাম স্মরণীয় এবং অপরিহার্যভাবে পারসিফোনের সঙ্গে টুসুও তোষলার যে উপাখ্যান আছে, তার সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

তাই টুসু ও তোষলার ভাব কারণটির ঐক্য থেকে একথা বলা নিরাপদ নয় যে, একটি থেকে অপরটির জন্ম। বরং মনে হয়, যদি একান্তই পূর্বোক্ত যুক্তিসমূহে প্রতিষ্ঠিত তোষলা টুসুর মার্জিত ব্রতরূপ' সিদ্ধান্তটি

অস্বীকার করা যায়, ব্রতভূমি ও উৎসবভূমিতে যেমন যেমন কৃষি সভ্যতা এসেছে তেমন তেমন স্বাধীনভাবে দুইভূমিতে টুসু ও তোষলার আবির্ভাব ঘোটেছে।

বর্তমান পরিচ্ছেদে যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হোয়েছে তার সার সংক্ষেপ এই: টুসু উৎসব থেকেই তোষলা ব্রতের সূচনা। একথা একান্তই অস্বীকার কোরলে বলা চলে টুসু ও তোষলা স্ব-স্ব ভূমিতে এরা দুটি স্বতন্ত্র বস্তু। তোষলা ব্রত থেকে 'টুসু' উৎসবের জড় কিছুতেই টেনে আনা যায় না।

ঐতিহাসিক বিবর্তন পথে টুসুর রূপকল্প।

"……in dealing with savage ideas of the inanimate, it must be kept in mind that non-living things are worshipped or feared not in any symbolical sense, which is altogather foreign to the lower inteligence, but as the supposed home of a spirit, or as in some sense a vehicle of power". অন্যত্রত মানুষেরা প্রকৃতির বস্তুপুঞ্জে বিভিন্ন শক্তির পরিচয় পেয়েছিলো। তারা যে গাছ-পাথর-নদীর পুজো কোরত সে কোনো প্রতীক-রূপের পুজো নয়, গাছ-পাথর-নদীর মধ্যে বিপদ ঘটাবার বা বা মঙ্গল করবার যে শক্তির সন্ধান তারা পেয়েছিল তারই আধার বোলে, গাছ-পাথর-নদীকে তারা পুজো করতো, কখনো ভয়ে, কখনো কৃতজ্ঞতায়। প্রাচীন মানুষের মনে কৃষি-চিন্তার ফলরূপ ভাবনায় মৃত্তিকা উৎপাদিকা শক্তির আধার রূপে কল্পিত হোলো। মানব-সমাজে নারীর মধ্যে এই গুণাটির স্ফুরণ। যুগের পর যুগ পার হোয়ে মানসিক চিন্তার প্রাথর্য নারী ও পৃথিবীকে বোঝাতে পরবর্তীকালে যে নারীর প্রতীকচিহ্ন বেছে নিলো, তা হোচ্ছে যোনী বা স্তন। তারই স্মারক হোলো কুণ্ড। মহাভারতের বনপর্বে সতীর যোনী ও স্তনের সহিত সংপৃক্ত তিনটি শক্তিপীঠের উল্লেখ আছে।

উৎসব-ভূমিতে টুসুর যে কটি রূপকল্প পাওয়া গেছে, ছোট কুণ্ডের রূপটি তন্মধ্যে প্রাচীনতম। এ থেকে অনুমেয় যে টুসু উৎপাদিকা শক্তিরই প্রতীক। মানুষ যখন অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধ হোয়ে বুঝল সার মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি

বাড়ায় তখন টুসুর কুণ্ডে স্থান পেল গোবরের বিজোড় সংখ্যক গুটি। প্রাচীন অনার্য সভ্যতায় বিজোড় সংখ্যা গননার প্রচলন ছিল। যুগান্তের পথ অতিক্রম কোরে টুসুতে বর্তমানেও এর ব্যবহার শিথিল হয় নি।

দূর অতীত থেকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে টুসুর নানা রূপান্তর ঘোটেছে। সুবিস্তীর্ণ উৎসব-ভূমিতে রূপকল্পের বৈচিত্র্যই তার স্বাক্ষর। রূপকল্পনাগুলির অনুসরণে ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারাটি স্ফুটতর হবে।

১। ছোটকুণ্ডাকার হলুদ-রাঙানো কাপড় ঢাকা একটি গর্ত।

২। একটি সরা, পিটুলি-গাবানো।

৩। প্রদীপ বসানো পিটুলি গাবানো সরা।

৪। পিটুলি-গাবানো বাঁশের টুপা [বাঁশের ছোট্ট ডালা]

৫। মাটির পুতুল-টুসু।

৬। চৌচল।

প্রথম চারিটিতে ভেতরে সর্বদা বিজোড় সংখ্যক গোবরের ও পিটুলির গুটি রাখার প্রথাটি অনিবার্য ভাবে অনুসৃত হয়।

ছোট কুণ্ডাকার টুসু উৎপাদিকা শক্তি ও গোময়-পিটুলি অনুসঙ্গে সারাম্বিতা বহুপ্রসবিনীর রূপে ভাবিত হোয়েছে। কুণ্ডের রূপ-সাদৃশ্য নিয়ে সরার উদ্ভব। উষ্ণ প্রস্তরের শীতহিম প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টায় উৎসব-প্রাঙ্গনের মানুষ সরার প্রচলন কোরল। প্রয়োজনমত ইচ্ছানুসারে সরাটিকে সুবিধামত জায়গায় সরিয়ে নেওয়া যায়। বাঁশের ব্যবহার যে অঞ্চলে বেশী সেখানে সরার পরিবর্তে টুপার ব্যবহার চলিত আছে। আধারটি বাঁশের হোলেও রূপ সাদৃশ্য ও তার ব্যঞ্জনায় সরার সঙ্গে এক। মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে টুসুর মাটির পুতুলের ব্যবহার দেখি। মূর্তিটি বাহনহীন, সাভরণা গভীর হলুদ রঙের একটি কিশোরীর। উচ্চতা অনধিক একফুট। টুসু যে অঞ্চলের লোক উৎসব, সেখানে ভাদ্রমাসে ভাদু নামে একটি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ভাদু কাশীপুরের মহারাজের অকালমৃতা কন্যা, এমনি কিংবদন্তী। এখনো কাশীপুরে ভাদর উৎসব মর্যাদার সঙ্গে রাজবাটীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই ভাদুর মূর্তি-পুজার

প্রভাবে টুসুর মূর্তির প্রচলন হোয়েছে বোলে মনে হয়। লোকউৎসবের অধিষ্ঠাত্রী টুসু চতুর্দোলায় গমনাগমন করেন, এই ভাবনা স্বাভাবিক। চতুর্দোলা শব্দটি ভাষাতত্ত্বের অনিবার্য বিবর্তনে 'চৌচল' হোয়েছে: চতুর্দোল-চৌদ্দল-চৌচল্ বা চউচল্। চৌচল্ রঙিন কাগজ ও সোনাকঞ্চি দিয়ে তৈরী এক, দুই বা ততোধিক বড়জোর আড়াই বা তিনফুট পর্যন্ত উচ্চ মন্দিরের মত দেখতে। তাজিয়ার সঙ্গে রূপ সাদৃশ্য বশতঃ কোন কোন প্রাবন্ধিক মনে করেন টুসু উৎসবে চৌচলের প্রচলন মুসলমান প্রভাবের পরিচয় বহন কোরছে। এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় কিছু বলা যায় না। মানভূমের পাড়া থানায় টুসুর কুণ্ড-রূপ চলিত আছে। পাড়া বিশেষ কোরে মুসলমান প্রধান অঞ্চল অথচ সেখানেই চৌচলের ব্যবহার কম। মানভূমের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত—থানা বাগমুণ্ডী, রাঁচী ও সিংভূমের প্রত্যন্তে মুসলমানদের সংখ্যা নগন্য। এই ছিঁটে-ফোঁটা মুসলমানের দেশেই চৌচলের বহুল প্রচলন দেখা যায়। ইহাই উল্লিখিত সন্দেহের একটি কারণ।

উপরোক্ত বিবর্তন ধারাটি থেকে প্রতীয়মান হয় টুসুর উদ্ভব উৎসব ভূমির কৃষিসভ্যতার যুগ থেকে অদ্যাবধি বিবর্তনের পথে ঘুরে ঘুরে বর্তমানের ঘাটে এসে ঠেকেছে। কৃষি-সভ্যতার প্রাচীনতম স্মরণচিহ্ন নিয়ে বর্তমান উৎসব-ভূমিটি বেদপূর্বদিনের বিস্মৃতদ্বার খুলে দেয়। যুগ-যুগান্তরের বদ্ধ দ্বারপথে ভীরু আলোকে দেখা যায় সুদূর বেদপূর্ব দিনে টুসুর উদ্বোধন কোরে, কোনো অর্বাচীন অন্যব্রত জাতি, আপনার কৃষি সভ্যতার সার্থক মনন বৃত্তির পরিচয় দিয়েছিলো, পরিচয় দিয়েছিলো কৃষি-ব্যাপারে সারের প্রাধান্য স্বীকারের শুভ বুদ্ধির।

বাহনের ইতিহাস পাঠে দেখতে পাই সমাজ জীবনের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয় বস্তুই দেবতার বাহন হোয়ে দেখা দিয়েছে। কৃষি-দেবতা শিবের বাহন ষাঁড় এবং নারদের বাহন ঢেঁকি। ষাঁড় ও ঢেঁকি কৃষি জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। টুসুর উপকরণ-গুলি এ সূত্রেও প্রাচীন কৃষি-সভ্যতার যুগ-স্মারক। টুসু উৎসব ভূমিতে এই সভ্যতা কত প্রাচীন সে বিষয়ে গবেষণার অবকায় রোয়েছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

সুকুমার সেন টুসুর ঐতিহাসিক দিকটির বিচারে একে প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরানো বোলে মনে করেন।

টুসু উৎসব।

ফসলদিনের সোনার ফলনে ঘরে খাবারের অভাব থাকে না। সারা বৎসরের জীর্ণ জীবন হেমন্তের পাকা-ধানের গন্ধভরা বাতাসে দুলে দুলে ওঠে। স্বচ্ছতোয়া নদীতে শান্তশ্রী পল্লীর কন্যা-বধূ-মা জল নিতে এসে দেখতে পান পশ্চিম দিগন্তে সূর্যদেব পলাশ রঙ মেখে লোহিত বর্ণ হোয়েছেন। অরণ্য উদ্বাহু হয়ে সূর্যের লাল রঙটি মুছে নিতে চাইছে। হয়তো বা সেই সময় দূরাকাশের কোলে দক্ষিণাপথে যাত্রা কোরেছে শীতার্ত উত্তরের বলাকাশ্রেণী। ভরাফসলের এমন অনির্বচনীয় দিনে তাদের মনে পড়ে হারিয়ে যাওয়া টুসুকে। জল নিতে এসে জল বাসিনী টুসুর জন্যে বেদনাতুর মন কলসী ভোরে ঘাট থেকে টুসুর স্মৃতি ঘরে নিয়ে যায়। এরপর থেকে টুসুর আকুল প্রতীক্ষায় অগ্রহায়ণের প্রতিটি সন্ধ্যা স্মৃতি বেদনায় নম্বর হোয়ে আসে। অবশেষে দিনগুলি ঝোরে যায়। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিন নদীতে নেমে জল থেকে টুসু-তোলার পালা মেয়েরা সাঙ্গ করে। যেখানে সরা বা টুপায় গোবরের আর পিটুলির গুটি সাজিয়ে ফুল ঢাকা দিয়ে মেয়েরা গান গায়। এতদিন জলে ছিলে এবার সারা পৌষ মাস চল আমাদের ঘরে থাকবে। তারপর রোজ সন্ধ্যাবেলা প্রতিবেশী মেয়েরা একটি ঘরে জমা হয়, কুলুঙ্গি থেকে টুসুকে নামিয়ে গান করে, ফুল দেয়, নিজেদের নিত্য আহার্য বস্তু—চিড়ে মুড়ি—টুসুকে উৎসর্গ করে। প্রতিদিন যে গানগুলি গাওয়া হয় তার পর্যায়ক্রম আছে। টুসুকে জাগাবার গান, নিত্যকার জীবনের কত ঘটনার বিবরণ, সবশেষে রাত্রি গাঢ় হোলে 'ঘুমেতে ঢুলু ঢুলু' টুসুকে ঘুম পাড়াবার গান।

এমনিভাবে সমস্ত পৌষমাস টুসুর গান রোজ সন্ধ্যাবেলা দিক্‌প্রান্ত ধ্বনিত কোরতে থাকে। পৌষের ম্লান-সূর্য দিনগুলি পেরিয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা শীত নামে, মাঠে, ঘাটে, গ্রামে, নদীতীরে কুয়াশার অবগুণ্ঠন ভেদ কোরে তখনো টুসুর গান গ্রাম থেকে গ্রামান্তের পথে মুঠো মুঠো জীবনের শস্যকণা ছড়িয়ে ছড়িয়ে চোলে যায়। পৌষ-সংক্রান্তির দিন সমস্ত রাত মেয়েরা গান গায়। ফুল দিয়ে মনের মতো সাজায় টুসুকে। প্রদীপ জ্বেলে দীপান্বিতা করে টুসুকে। চালের পিঠে ও মিষ্টি কোরে ভোগ দেয়। রাত্রি ভোর হয়। মাঘের প্রথম সূর্যোদয়ে শীতের সকালটি যখন শিশিরসিক্ত কপোলে তন্দ্রায় মগ্ন, তখন গাঁয়ের মেয়েরা পথের ঘুম ভাঙিয়ে দলে দলে টুসু ভাসাতে নদীর পথে চলে। মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের দল পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে। গানে গানে কথা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দলগতভাবে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হোয়ে ওঠে তারা। এই গানগুলির সর্বাঙ্গে যৌন-কামনার জ্বালা। গানের কথা ও অঙ্গভঙ্গীতে স্পষ্ট বাসনাগুলি উদ্দাম বন্য-জীবনকে পাপড়িতে পাপড়িতে ফুটিয়ে তোলে। শহর ও উপান্তের ভদ্র-চিন্তার মেয়েরা গানের লড়াই'এ নামলে পরস্পরের টুসুর কল্পিত কুশ্রীতাকে ব্যঙ্গ করে।

তারা দলে দলে নদীতীরে নেমে আসে। জলে দাঁড়িয়ে গান গাইতে গাইতে তারা টুসুকে বিসর্জন দিয়ে স্নান করে। কখনো কখনো স্নান সেরে টুসু ভাসায় সিক্ত-মনে, সিক্তবাসে শিক্তকেশ পিঠে এলিয়ে দিয়ে। উত্তরায়ণের সূর্য তাদের সর্বাঙ্গ চুম্বন করে। তারপর প্রত্যাবর্তনের পথ। কণ্ঠে তখন গান থাকে না। সূর্যদেব মধ্যগগনে।

টুসু গানে টুসু চরিত্রের উপাদান, সমাজচিত্র ও লোকজীবনের পরিচয়।

টুসুগানে টুসুর চরিত্র চিত্রণের অবচেতন প্রয়াস আছে। গায়ক গায়িকার দৈনন্দিন জীবনায়নের অনিবার্য প্রভাব টুসুকে তাদেরই মতো মানবীয় গুণে গুণান্বিতা কোরেছে। এই গানগুলির মধ্যে টুসুর যে পরিচয় তা কোন শাস্ত্রীয় বা লৌকিক দেবীর নয়। টুসু গা দুলিয়ে স্নান করে, হাতে তার তেলের বাটি, সে যখন নুয়ে নুয়ে চুল ঝাড়ে যেন তার গলার সোনার-কাঠি ঝিলিক দিয়ে উঠে। টুসু ঘর-করনার কাজে পাকা। সে খুব ভাল

পর্ণকুটিরের সামনে পূজারিনীরা দাঁড়িয়ে আছে।

মুড়ি ভাজতে পারে, রুটি বেলতে পারে, বাটনা বাঁটতে পারে। টুসু বেড়াতে যায়, কয়লা খাদের জলতোলা সম্বন্ধে তার কৌতূহলের অন্ত নেই। পায়ে মল ও গায়ে মটর শাড়ি পোরতে সে ভালোবাসে। রাত্রি হোলে শিশুর মতই সে ঘুমে ঢুলু ঢুলু কোরতে থাকে। সে যখন শ্বশুর বাড়ী যায় তখন মা'র জন্য কান্নায় অস্থির হয়। জলে যেতে টুসুর ভারি আনন্দ। জলে যে তার শ্বশুর বাড়ী। এইসব ছিন্নসূত্র গ্রথিত কোরে একটি গল্প তৈরী করা যায়।

টুসুর শ্বশুর বাড়ী জলের তলায়। সে সেখানে পৌষ-মাস ছাড়া বাকী এগারো মাস বাস করে। অগ্রহায়ণের শেষে সে বাপের বাড়ী এলে বাপের বাড়ীর লোকদের আনন্দ ধরে না। গোলা ভোরে যায় ধানে, মন ভোরে ওঠে আনন্দে। উৎসব শুরু হয়, সে উৎসব একমাস ধোরে চলতে থাকে। তারপর টুসু কত-কী কোরে যে এই দিনগুলি কাটায় তার হিসেব নেই, বাপের বাড়ী গোনাগুন্তি কটি দিন। শ্বশুর বাড়ী যাবার দিন ঘনিয়ে আসে। উৎসবের শেষ দিনগুলি আগত বিচ্ছেদের ব্যথাকে ঢাকতেই হয়তো দ্বিগুণ উচ্ছলতায় গান গেয়ে উঠে। পৌষ সংক্রান্তির দিন টুসু শ্বশুর বাড়ী যায়—জলের তলায় শ্বশুর বাড়ী। পৃথিবীতে নেমে আসে শীতের কুয়াশা।

এই সূত্রে গ্রীকদেবী দেমেতের কন্যা পারসিফোনে-উপকথা স্মরণীয়। পারসিফোনে ধরিত্রীর কন্যা। এশিয়-মাইনর থেকে তাকে অইডোনেয়াস পাতালে ধোরে নিয়ে গেলে ধরিত্রীর দুঃখে পৃথিবী শস্যহীন হোয়ে এলো। তারপর পারসিফোনে ধরিত্রীর কোলে ফিরে এলে বসুধা শস্যশ্যামাঞ্চলা হোয়ে উঠলেন। কিন্তু পারসিফোনেকে পাতালে অইডোনেয়াসের কাছেও বছরের কিছুটা সময় থাকতে হত। সে পাতালে গেলে পৃথিবীর শস্যও শুকিয়ে আসত। উপকথাটি সম্বন্ধে বলা হোয়েছে "the meaning of the legend is obvious : Persephone, who is carried off to the lower world, is the seed corn, which remains concealed in the round part of the year ; Persephone, who returns to her mother, is the corn which rises from the ground, and nourish men and animals." কৃষি সভ্যতার সঙ্গে এমনিভাবে টুসুও জড়িত সে কথা পূর্বাধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

টুসু চরিত্রের উপাদান সমন্বিত কটি গান :

১। টুসু সিনাছ্যান টুগা হিলাছ্যান

হাতে তেলের বাটি।
ছয়ো ছয়ো চুল ঝাড়ছেন
গলায় সনার-কাঁঠি॥

২। চল্ টুসু চল্ খেলতে যাব
রাণীগঞ্জের বড়তলা।
আস্‌বার বেলা দেখাঁই আনব
কয়লা খাদের জল তুলা॥

৩। জলে হেল জলে খেল
জলে তুমার কে আছে।
আপন মনে ভাবে দেখ
জলে শ্বশুর ঘর আছে॥

৪। আবার টুসু মুড়্‌হি ভাজে
কিবা ঘড়কা লড়ে গ।

৫। আমার টুসু বেড়াতে যায়
চন্দন কাঠের চৌদলে।

টুসু গানগুলি লোক সাহিত্যের মর্যাদা পাবার উপযুক্ত। সমাজজীবনের সঙ্গে লোকসাহিত্যের সম্পর্ক অতি নিবিড় বোলেই সমাজজীবনের ক্রমান্বয় পরিবর্তনে লোক-সাহিত্যেরও রূপাবর্তন ঘটে। এর লোকগীতিগুলি লোকমুখে প্রচারিত হয়। টুসু গানের প্রচার এমনি ভাবেই হোয়েছে। গানগুলি ছোট এবং মুখে মুখে প্রচারের উপযুক্ত। "Folk songs are best defined as songs which are current in the repatory of a folk group. .....what ever the sources, however, it is oral circulation, that is the best general critarian of what is folk song." হলে টুসু গানগুলিকে অনায়াসে লোকগীত বলা চলে। অধুনা কতিপয় টুসু গানের বই প্রচারিত হোলেও এর বিস্তৃতি ঘোটেছে বহুদিন ধোরে বহুক্লেশে দূর দূরের গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তে লোক মুখে মুখে। জীবনের গভীর থেকে গানগুলি উদ্বুদ্ধ হোয়েছে বোলে এগুলিতে কবিত্ব করার ও সালঙ্কার সজ্জার ক্ষীণতম প্রকাশও নেই। সহজ প্রকাশ যদি গুন হয় তবে গানগুলি সহজ-গুনে গুনান্বিত। সহজ প্রসাদগুনে জীবনের সুখ-দুঃখ ময় যাত্রাপথটির চিহ্ন এঁকে এঁকে এরা পৌষের শীতরাত্রে গ্রামপ্রান্ত ধ্বনিত করে, গ্রামের মাটি গন্ধমাখা জীবনের ছবি গায়ের মেয়েগুলি স্নানে চোলেছে, কেউ আগে, কেউ পেছনে, গুধিয়ে নিচ্ছে তোরা কোন ঘাটে যাবি :

মকর গঙ্গাজল্
তরা কন ঘাটে চান্ করবি বল।
মকর গঙ্গাজল্।

সতীনের জ্বালা বড় জ্বালা, সেই সতীনের বাড়ীর বেগুন আর রামকানালের শামুক দিয়ে তরকারী হোয়েছে। দুঃখদীর্ণ জীবনে দরিদ্র পরিবারে এর চেয়ে বেশী উপকরণ আশা কোরতে পারে নি :

ও টুসুর মা ও টুসুর মা
তদের কি কি তরকারী।
ওই সতীনের বাড়ীর বাইগন
রামকানালের গগলি।

বা,

বাড়ীর নাময় ক্ষিরাই নদী
ভাসে আইল ওল লো।
ওলের গরব নিম ছেঁচকি
মাছের গরব ঝোল লো।

সুখ-দুঃখের এই বিচিত্র পটভূমিতে নারীর উদ্দাম স্বাধীনতা বিদ্রোহ কোরতে দ্বিধা করেনি যখন সে দেখেছে তার উপর অত্যাচারের খড়্গ নেমে আসছে বার বার। তারই বিচিত্র প্রকাশ টুসু গানে নানাভাবে দেখতে পাই।

গাঁকে আইল ঢাকাই শাড়ি
দিদি লিতে দিল নাই।
আসুক বছনই বলিই দিব
দিদির সতীন হব নাই।

কখনো স্বামীর অত্যাচারে সে জর্জরিত হোলে স্বামীর ঘর ছেড়ে চোলে যেতে চায়। হয়তো অন্য কোন পুরুষ

তার অপেক্ষায় আছে। এমন যাওয়ায় এদের সমাজে পাতিত্য ঘটে না। সে বোলছে :

লে রে তর ছ্যালাগুলা
লে রে তর লুহাটা
আমি, তর ঘর করব নাই।

বা,

এক কীল সইব দু-কীল সইব
তিন কীল বই আর সইব না
যা লো ননদ বইলে দিবি
তর দাদার ঘর আর করব না।

বৃদ্ধ-পতি বরণ কোরবে না মেয়েটি, সে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে তাই বলে :

বুঢা বরে কেনে সাঁধাব
বরং বেগুন গাছে টাঙ্গাব।

আবার, কোন বিরহী বা জীবনের স্বল্পতম স্বাচ্ছন্দে উল্লসিত হোয়ে প্রিয়ার কথা ভাবতে বসে :

বড় বাঁধের ইঁচলি সাঁটা
বিকব ভবের বাজারে।
যার লাগে প্রাণশশী কাঁদে
সে রইল বাপের ঘরে

বিরহ মিলনের অকৃত-যন্ত্রণাই বিশ্বের সকল সাহিত্যের প্রধানতম উপজীব্য। ইহার বিচিত্র গতি-প্রকৃতির মূল্যেই বৈচিত্রময় জীবনের উপন্যাস রচিত হয়েছে, কবিতা, গান, গাথা ও মর্মর প্রতিমায় প্রাণ সঞ্চারিত হোয়েছে। বিচ্ছেদে অভিমানিনী কোন অন্যব্রতার কণ্ঠে তাই গান শুনি, ডিগদা ডিদাং শব্দে রেল গাড়ি চোলেছে। পাতলা মলমলের চাদর পুরুল্যা থেকে কিনে এনেছিল, সে চাদরটা বাতাসে উড়ে গেলে আর ধোরে রাখবে না। ভালোবাসার সঙ্গে যেন জমিনদহে দেখা হয়। দেখা হোলে কিন্তু কিছুতেই তার সঙ্গে কথা বলবে না।

পুরুল্যার মলমল চাদর
উড়ে গেলে ধরব না
ডিগদা ডিদাং রেলগাড়ি চলে।
হায় ভালবাসা,
যেন জমিনদহে হয় দেখা।
যার সাথে বিচ্ছেদের কথা
জিউটা গেলে কাঁদব না
ডিগদা ডিদাং রেলগাড়ি চলে।

জগতের দুর্জ্ঞেয়তম জিনিসগুলির মধ্যে যুবতী-জন-চিত্ত অন্যতম। ইহার আদি অন্তহীন বিস্তার যুগ যুগান্ত ধোরে কবি মানসে রহস্যের সৃষ্টি কোরেছে। যে মেয়েটি ভালোবাসার সঙ্গে দেখা হবার আশা নিয়ে জমিনদহে গেল, যে দেখা হোলেও কথা না বলার দুরূহতম প্রতিজ্ঞা কোরেছিল সে ইঙ্গিতে, চোখের ইশারায় বার বার তার মনের কথাটি জানিয়েছে তার প্রিয়তমকে। অবশেষে উদ্বেগাকুল কণ্ঠে বোলেছে :

বুঝলি না হাতের ইসারা
তকে কতই দিব চইখ ঠারা।

উৎসবভূমির যে অঞ্চলে ব্রতভূমির ক্ষীণতম প্রভাব পড়ে নাই, সেই সব অঞ্চলের টুসু গানে ও ছড়াগুলিতে আদিম জীবন ও মাটির গন্ধ লেগে আছে। উৎসবের সঙ্গে জড়িত বহু রীতিনীতির মধ্যে জীবনের পরিচয়

লুকিয়ে আছে। টুসুর সময় ইঁদুর শিকার করা, দলবদ্ধ মেয়েদের ভিক্ষা করা—প্রভৃতি বহু প্রথায় উৎসব ভূমির বিচিত্র জীবনযাত্রাটি ছবির মত চোখের সামনে জলজল করতে থাকে। এই গানগুলি যে জীবনের পরিচয় বহন করে, সে আদীম জীবন, অসংস্কৃত অমার্জিত। জীবনের ক্ষেত্র থেকে তুলে আনলে গানগুলির সৌন্দর্য অনিবার্যভাবে ক্ষুন্ন হবে, এবং যেখানে স্থাপন করবো তার সৌন্দর্যও কিছুমাত্র বাড়বে বোলে মনে হয় না। কিন্তু পূর্বতন পরিচ্ছেদে আদিম জীবন ও সমাজের অনুব্রত মানুষগুলির উৎসব বোলে টুসুকে যেখানে পরিচিত করা হোয়েছে তার অনুসন্ধে এমনি হাজার হাজার গানের কতিপয় মাত্র তুলে দিচ্ছি।

১। সবাই গেল ইঁদুর কুড়াতে
আমি যেতে পেলম না,
ইঁদুর পিঠা বড় মিঠা
শ্যামকে দিতে পেলম না।

২। একটা নাকে দুটা নাকছাবি,
তুই ঘর করবি
না বেহ্‌রাই যাবি,

৩। কুঁচড়ির চালে ভাত রাঁধেছি
কমরে বল হয় বলে
আমার সঙ্গে লিয়াই লাগবি
কমর বাঁধে আয় চলে।

৪। আয়ন সহর বায়না সহর
রসিক সহর কলক্যাতা।
মেদনীপুর‍্যা ঢাকাই শাড়ি
কই দিলিরে লপ্যাটা?

৫। মকর পরবে।
ছঁড়িদের পা পড়েনা গরবে
মকর পরবে।

৬। মকর সিনাব।
গিনান করে ওই ছঁড়াকে
তিনঘাট জল খাওয়াব
চিড়া কুটাব।

শেষের দুটি গান যুবক-যুবতীর দলগত কলহের পরিচয় বহন কোরছে।

এই সমস্ত গান কে কবে রচনা কোরেছিল জানা যায় নি। কবে এর উদ্বোধন তাও জানবার উপায় নেই। সমস্ত গ্রামের জীবনছন্দ এর মূলে জড়িয়ে আছে এবং এই জীবনমন্থন সঞ্জাত অমৃতও বিষ এদের উপাদান। দৈনন্দিনতার শৈলপথে বারংবার প্রতিহত তবুও নিত্য সংগ্রামশীল এই জীবনকে দুঃখশোকদারিদ্র্য তীক্ষ্ণ চঞ্চুতে ছিড়ে ছিড়ে সংসার প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছে। "তবু একটা ছন্দ, একটা সুর চাই। মানুষের পক্ষে ইহার একটা একান্ত প্রয়োজন আছে। যে সকল সাংসারিক ব্যাপারের দ্বারা সে সর্বদা ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিবৃত তাহাতে সে ছন্দ লয়ে মণ্ডিত করিয়া তাহার উপর নিত্যসৌন্দর্যময় ভাবের রশ্মিপাত কোরিয়া দেখিতে চায়।" এই গানগুলিতে জীবনের ঐকতান ঝঙ্কৃত। এই ঐকতান সভার ভাব ছন্দ ও সুরের শূন্য আসনগুলিতে উদ্‌ভূত প্রান্তরের আকাশনীল মনগুলির 'জীবনসুখসম্ভোগের আনন্দধ্বনি' বেজে ওঠে। আমাদের এই অখ্যাত গানের অনাথা কবির দল উৎসব ভূমি ছেড়ে কখনো কোনো সূত্রেই বাহিরে আসে নি। তারা "কল্পনার সংকীর্ণতার দ্বারাই আপন প্রতিবেশীবর্গকে ঘনিষ্ঠসূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছে এবং কেবল সেই কারনেই গানের মধ্যে কল্পনা প্রিয় একক কবির নহে, পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।"

টুসুর ছড়া

তোষলার ছড়াগুলির সঙ্গে টুসুর ছড়াগুলির বিষয়গত পার্থক্যের কথা বলা হোয়েছে। তুলনামূলক বিচারে এদের ভাব ও রূপ সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন।

তোষলাব্রতের ছড়াগুলির একটি বাঁধুনী আছে এবং সমস্ত ছড়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কোরেছে একটি, ব্রতমানস। ব্রতসূত্রে গাঁথা ছড়াগুলি কামনা-বাসনা-প্রার্থণার রঙে রঞ্জিত। তোষলার স্তুতি:

তুম তুষলি তুমি কে।
তোমার পুজা করে যে
ধানে ধানে বাড়ন্ত
সুখে থকে আদি অন্ত॥

"অনুষ্ঠান উপকরণের বর্ণনা:

গাইয়ের গোবর, সরষের ফুল
আসন পিঁড়ি এলো চুল,—
গেয়ের গোবরে সরষের ফুল,
ঐ করে পুজি আমরা মা বাপের কুল।

"এরপরে মেয়েরা তোষলা ব্রতের কামনা জানাচ্ছে:

কোদাল কাটা ধন পাব,
গোহাল আলো গোরু পাব,
দরবার আলো বেটা পাব,
সভা আলো জামাই পাব,
সেঁজ-আলো ঝি পাব'
আড়ি-মাপা সিঁদুর পাব। ইত্যাদি।"

তারপর ব্রত সাঙ্গের দিন শীত-সকালে সূর্য ওঠে। সূর্যের সঙ্গে তোষলার বিয়ে দিয়ে তাকে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। এই ভাবে সুগঠিত আখ্যায়িকার পট-ভূমিতে তোষলার ছড়াগুলি পরস্পর আবিচ্ছেদ্যভাবে সংপৃক্ত। আখ্যায়িকার এই ছড়াগুলিকে সাজিয়ে কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা যায়। যেমন,

প্রথম পরিচ্ছেদ: তোষলার আবির্ভাব ও স্তুতি।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: তোষলার রূপ বর্ণনা, উপকরণ ও অনুষ্ঠানের বিবরণ।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: তোষলার নিকট মেয়েদের কামনা জানানো।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: কামনা জানিয়ে বিসর্জনের অয়োজন। বিসর্জনের দিনটির প্রাকৃতিক বর্ণণা।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: তোষলার সঙ্গে সূর্যের বিবাহ।
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: বিবাহের পর বিসর্জন। স্বামী সহ তোষলার অভিগমন।
সপ্তম পরিচ্ছেদ: ব্রতের ফলশ্রুতি।

টুসুর ছড়াগুলি সম্পূর্ণ ভিন্নজাতির। এরা পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত নয়। কখনো কখনো টুসুর একই ছড়ার চারিটি কলির মধ্যেও সংলগ্নতা থাকে না। কিন্তু এই ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছত্রেই জীবনের যে ছবি ফুটে ওঠে তা অনবদ্য। ছড়ার প্রকৃতি বিচারে এই ভাবে দেখতে পাই তোষলা ব্রতের ছড়াগুলির চেয়ে টুসুর ছড়াগুলি অধিকতর সার্থক।

"যে ছন্দে স্বরাঘাত প্রবল হোয়ে ছন্দের বৈশিষ্ট্য দান করে তাকে স্বরঘাত, স্বরমাত্রিক বা স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ বলে। এই ছন্দেই গ্রাম্যছড়া রচিত হয়। ইহাতে প্রবল স্বরাঘাত থাকায় একটি উল্লেখযোগ্য দোলার সৃষ্টি হয়।" টুসুর ছড়াগুলি ছন্দ বিচারে ত্রুটীহীন।

১। ছুট ছুট গাছগুলি
কতই যতন করব
তুই ধনি চিন্তামনী
তকেই বিহা করব।

২। চল্ টুসু চল্
মেঘে অ্যাল জল্,
গাব্‌ল তর মটর শাড়ি
পায়ে জড়া মল্।

৩। জড় গাছের আড়েরে
আঢ়াইয়া চাঁদ,
পৌষমাসে পুজব টুসু

টুসানুকে আন্।

৪। থপা থপা সরসা ফুলটি
হলুদ বলে বাঁটেছি
হেই শাশুড়ি রগাল জিওনা
পাশা খেলতে বসেছি।

৫। চল্ সাম্‌সাহারে,
টুসুর বিহার জল সাইবারে।
চল্ সাম্‌সাহারে।

ছোট ছোট গাছগুলিতে জল দিতে দিতে কেন যে বিয়ে করার সখ হোলো সে কথা আমাদের কবি বলেন নি। এবং আশ্চর্যের বিষয় জগতে এত মেয়ে থাকতে সেই একমাত্র চিন্তামনী ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করার কথা সে ভাবতে পারে নি। প্রথম উদ্ধৃতির এইতো বাঁধুনী। দ্বিতীয়টি একটি সুন্দর ছবি, চিত্র থেকে আবার পরক্ষণেই আমাদের মন সুরের ক্ষেত্রে দিশাহারা হয়। মটর শাড়ি পোরে, পায়ে মল দিয়ে স-সখি টুসু ঝম্ ঝম্ শব্দে মল বাজাতে বাজাতে বেড়াতে গেছে। এমন সময় বৃষ্টি নামল। ধারাপাতের সুর, ত্বরান্বিত পায়ে চলার দ্রুতি, মটর শাড়ি ও পায়ের মল ভিজে বিবর্ণ হোয়ে যাবার ব্যাকুলতা অকস্মাৎ ছবি থেকে সুর-রাজ্যে আমাদের মনকে পৌঁছে দেয়। আর একটি ছবি,—অশথ গাছের চিক্‌চিকে পাতার আড়ালে তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদ উঠেছে। এমনি সব ছবি ছেড়ে জীবনের অঙ্গনে নামলে অন্য জগতের অনবদ্য ছবি ফুটে ওঠে। কোন একটি চঞ্চলা বধূ হলুদের বদলে ভুল করে থোপা থোপা সরসে ফুল বেঁটে তাড়াতাড়ি খেলতে বসেছে। একদল মেয়ে ঝম্‌ঝম্ শব্দে মল বাজিয়ে শ্যামসায়েরে টুসুর বিয়ের জল সাইতে চলেছে। এখানেও ধ্বনিই প্রধান।

টুসুর এই সমস্ত ছড়ার ভাঙা ভাঙা ছত্রে এমনই সহজ ভাষায় কত সুন্দর সুন্দর ছবি যে আঁকা আছে তার ইয়ত্তা নেই।

ব্রতভূমিলগ্ন উৎসব ভূমিতে বাংলা মননের প্রভাব।

উৎসবভূমির বহুধারাজীবনের বিচিত্র পরিচয় পূর্ব পূর্ব পরিচ্ছেদে ছড়া-গানের সূত্রে আমরা পেয়েছি। এই জীবন ধারার সঙ্গে ব্রতমানসপুষ্ট জীবনের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রতভূমিলগ্ন উৎসবভূমিতে টুসুর দু-একটি রীতিতে ও গানে এমন কতিপয় কলি পাওয়া যায় যাতে বাংলা মননের স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে টুসুর বিয়ের একটি রীতি দেখি। একদলের টুসুর সঙ্গে অন্যদলের টুসুর বিয়ে, বিয়ের মতই ঘটকালি প্রভৃতির পথ দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। টুসু স্ত্রীবাচক এবং উভয় টুসুর বিয়ে অর্থে স্ত্রীর সংগে স্ত্রীর বিয়ে। এটি সম্ভব নয়। তোমলার সঙ্গে সুর্যের বিয়ের প্রভাব হয়তো এখানে কাজ কোরেছে।

বাংলাদেশ রামপ্রসাদের দেশ। আগমনী বিজয়ার সংগীতরসে বাংলার স্মৃতিকা সিক্ত। বিজয়া গানের রেশ

কোনও কোনও টুসু গানেও দেখি।

এতদিন রাখিলাম মাকে গুঁজি-কপাট দিয়ে গো।
আর রাখিতে লাল্লম মাকে মকর এল লিতে গো॥
এতদিন রাখিলাম মাকে মা বলে আর ডাকলে না।
যাবার সময় রগড় ধরলে মা ছাড়া বই যাব না॥

টুসু গানের পাঠান্তর।

এই সমস্ত টুসু গানগুলি উৎসবভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পোড়েছে। মুখে মুখে এদের প্রচার, তাই পাঠান্তর স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ ছড়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে বোলেছেন "ইহারা সজীব, ইহারা সচল, ইহারা দেশ কাল পাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। ছড়ার সেই নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতি দেখাইতে গেলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রক্ষা করা আবশ্যক।" লোকসাহিত্যের সঙ্গে লোকজীবনের বন্ধন অচ্ছেদ্য। যে কোন ক্ষেত্র থেকেই এই জাতীয় সাহিত্য উদ্বুদ্ধ হোক না কেন মৌখিক প্রচারই লোক গীতির বৈশিষ্ট। জীবন পরিবর্তনশীল; এবং লোক-মুখে প্রচারের ফলে পরিবর্তনশীলতার পটভূমিতে ইহাদের পাঠান্তর অবশ্যম্ভাবী হোয়েছে। পাঠান্তরভেদ যুক্ত কতিপয় টুসু গান উদ্ধৃত হলো।

প্রথম পাঠ :

টুসু সিলাচ্যান গা হিলাচ্যান
হাতে তেলের বাটি
হুএঁ হুএঁ চুল ঝাড়চ্যান
গলায় সোনার কাঠি।
কার ঘরে মা বউঝি আছে
কেবা খায় মা পান
শাশুড়ি ননদীর ঘরে হয় অপমান।

দ্বিতীয় পাঠ।

টুসু গিনছ্যান গা ধুলাছ্যান
হাতে তেলের বাটি
সুএঁ সুএঁ চুল ঝাড়ছ্যান
গলায় গজমতি গো,
গলায় গজমতি।
* গলায় ত গজমতি বেশ সাজেছে।
* হাতে ত রক্তমালা পদ্ম ফুটেছে॥

তারকা চিহ্নিত কলিদুটির সঙ্গে মিল দেখতে পাই অন্য একটি ছড়ার দুটি-কলির। রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্যে' সে কলি দুটি আছে।

"হাতে তাদের দেবশাঁখা মেঘ লেগেছে।
গলায় তাদের তক্তিমালা রক্ত ছুটেছে॥"

প্রথম পাঠ।

হায় ভালবাসা!
যেন তমিনদহে হয় দেখা।
যার সাথে বিচ্ছেদের কথা
জিউটা গেলে কাড়র না
ডিগ্‌দা ভিদাং রেলগাড়ি চলে।

দ্বিতীয় পাঠ।

বাইগণ পোড়া বড় মিঠা
চপা বই আর ফেলব নাই,
যার সঙ্গে মরমের কথা
প্রাণ গেলে আর ছাড়ব নাই।

টুসুগানে রাজনীতির রঙ।

একে টুসু লোকউৎসব তায় গান এর প্রাণ। গানের মতো মানুষের মন জয় করার বস্তু আর কোন নেই। এইসব গুণ দেখেই হয়তো বা রাজনীতিতে একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী বিশেষ উদ্দেশে টুসু গানের নব-সংস্করণ বের কোরলেন।

মানভূম জেলা বিহার প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের সময় লোক-সেবক-সংঘ মানভূম প্রভৃতি জেলার বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্চলগুলির বঙ্গ-ভুক্তি দাবী কোরে যে রাজনৈতিক আন্দোলন কয়েক বছর আগে চালিয়েছিলেন তারই আওয়াজ শোনা গেল টুসু গানে। এই আন্দোলনের আলোচনার বিস্তৃতি না ঘটিয়েও বলা চলে চেতনভাবে হোক, অবচেতনভাবে হোক লোকজীবনে রাজনীতির একটি পটভূমি এই সমস্ত টুসুগানের ছায়ায় রচিত হোলো। মানুষের জীবনে বর্তমানযুগ অনিবার্যভাবেই রাজনীতি এনে দেয়। নব-সংস্করণের টুসু গানগুলি যুগের এই উদ্দেশ্যটি সফল কোরেছে। লোক-উৎসবের গানে অতঃপর লোক-জীবনের চেতনা-প্রবুদ্ধ রাজনীতির ছাপ পড়লো। গানগুলির কটি ছিন্ন-কলি নীচে তুলে দিলাম।

১। "বয়ে যায়রে বেলা
প্রাণের টুসু সাজারে ভাই এইবেলা
আয় ভাই সবে দলে দলে
মাতৃভাষায় গান বলে
রংয়ে রংয়ের কুসুম তুলে রে
টুসুর গলে দাও মালা।"

২। মোদের টুসুর দৌলতে
মানভূম চলে গেল বাংলাতে।"

৩। 'বিহার আইনে
(ও টুসু) তোর পুজা নাই বিধানে।'

আন্দোলনের দিন পেরিয়ে গেছে। এখন এই গানগুলি আর অতবেশী চলে না। জীবনকে যারা ভালোবাসে তারা তার ভালো মন্দ সুখ দুঃখ সব নিয়েই তাকে সম্পূর্ণ কোরে দেখে। একদিকের অনির্বাণ দুঃখ দীপ তাদের জীবনের অন্যপৃষ্ঠার সুখ সুপ্তির শিয়রে অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে। পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ দিয়ে জাতির রথযাত্রা। উৎসবভূমির জীবনে কত যুগের কত বিপর্যয় পেরিয়ে গেলো কিন্তু জীবনের জয়গানে সম পড়ে নি। লোক-উৎসবে যুগের প্রয়োজনে নূতন জোয়ার এসেছে; গানের অনিবার ধারাটি প্রাণের প্রকাশে স্ফূর্ত হয়েছে। সমস্ত জাতির প্রাণরসে অভি-সিঞ্চিত হোয়ে গান ও ছড়াগুলি গ্রাম থেকে গ্রামান্তের কুটিরে কুটিরে, মাঠে, ঘাটে, নদীতীরে ছড়িয়ে পড়েছে। একটি একটি কোরে দেখলে এরা বড়ো অসার্থক, বড়ো অসহায় নিতান্তই অর্থহীন; কিন্তু জীবনের সংগে সংপৃক্ত কোরে সমস্তগুলিকে একসংগে দেখলে সমস্তজাতিটাই এদের মধ্যে রক্তমাংসে সজীব হোয়ে কথা কোয়ে ওঠে। তখন এই সমস্ত গান ও ছড়াগুলির "একটি ছত্রে একটি কথায় সুখ দুঃখের এক একটি বড়ো বড়ো অধ্যায় উহ্য" রয়েছে দেখা যায়। জাতির সেই সুখ দুঃখের আপন কথাটির সঙ্গে সহৃদয় পাঠকের পরিচয় কোরিয়ে দিতেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

গ্রন্থপঞ্জী।

১। লোকসাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ।
২। বাংলার ব্রত : অবনীন্দ্রনাথ।
৩। বাংলার লোক সাহিত্য : আশুতোষ ভট্টাচার্য।
৪। বাঙ্গালীর ইতিহাস : নীহাররঞ্জন রায়।
৫। বাংলাছন্দের মূলসূত্র : অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।
৬। Social Development ; Its. nature and condition : L. T. Hobhouse.
৭। The Development of Hindu Iconography : J. N. Banerjee
৮। Pain and Pleasure : H. Ellis
৯। The Gods of Greece : Louis Dyer
১০। Psychology of Sex : H. Ellis
১১। Classical Dictionary : W. Smith (Edited)
১২। Indian Folk-Lore :
১৩। টুসু সঙ্গীত : লোকসেবক সংঘ প্রকাশিত।

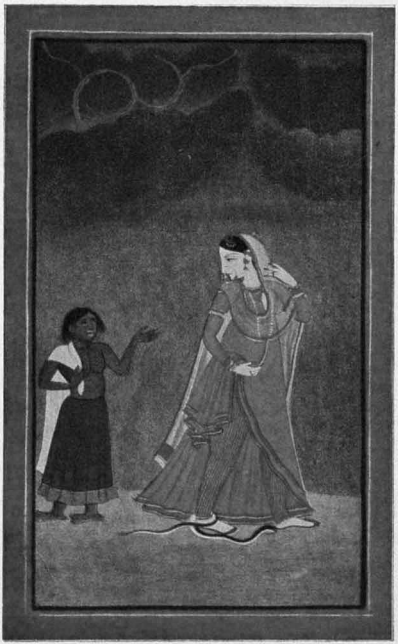

কৃষ্ণ-অভিসারিকা নায়িকা

। কাঙড়া শৈলী ।

সিরকা : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ

বিচারপতি এ. এন. সেনের সংগৃহীত কয়েকটী প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি

কৃষ্ণ-অভিসারিকা নায়িকা

। কাংড়া শৈলী ।

সিরকা : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ

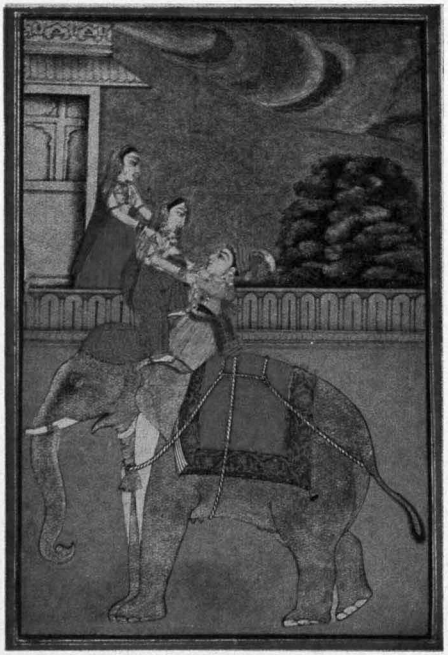

পলাতকা রাজকুমারী বাসন্তিকা

। রাজপুত-মুগল শৈলী ।

সিরকা ঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ

মহারাজা শ্রীঅজয় সিংজী

। যোধপুর শৈলী ।

সিরকা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ

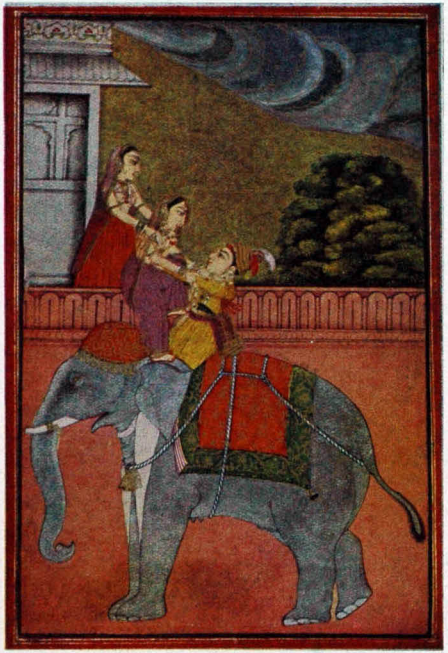

পলাতকা রাজকুমারী বাসন্তিকা

। রাজপুত-মুঘল শৈলী ।

সিরকা ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ

মহারাজা শ্রীঅজয় সিংজী

। যোধপুর শৈলী ।

সিরকা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ

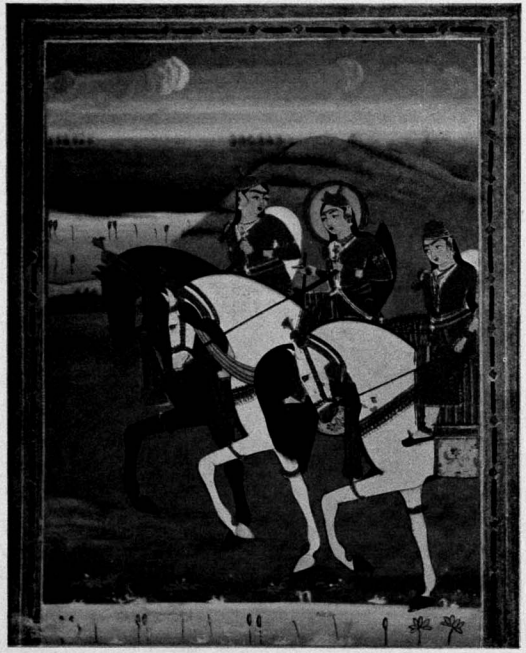

সখি সহ রাজকুমারীর অশ্বারোহণ
। রাজপুত-মুঘল শৈলী ।
সিরকা : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ

শান্তিনিকেতনের শিল্পী এ. পেরুমল

গৌরতনু যে সুপুরুষ শিল্পী শান্তিনিকেতনের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার প্রিয় তাঁর নাম এ. পেরুমল। সংক্ষেপে, পেরুমলদা। আর এই জন্যেই তিনি সেখানকার সর্বজন পরিচিত। প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছর ধোরে তিনি এখানে আছেন। শান্তিনিকেতন কলা ভবনে বহু তরুণ ও নবীন শিল্পী তাদের সাধনার পথে এঁকে পেয়ে ধন্য হোয়েছে। সদালাপী মিষ্টভাষী এই মিশুকে লোকটি যেন প্রত্যেকের আপন জন।

প্রায় চারশো বছর আগে তুঙ্গভদ্রা নদীর ধারে শক্তিশালী বিজয়নগর নামে যে সহর ছিল, বিদেশীয় আক্রমণের ফলে তা একেবারে ধ্বংস হোয়ে যায়। ফলে, স্থানীয় বাসিন্দারা আক্রমণকারীর ধর্মে দীক্ষিত

পঙ্কজ কুমার বন্দোপাধ্যায়

মূলত শিল্পী হোলেও পঙ্কজ কুমার বন্দোপাধ্যায় সুলেখকও বটে। বর্তমান রচনায় তাঁর তুলি ও কলমের বিরল সমন্বয় সম্ভব হোয়েছে। এই স্কেচগুলি তাঁর শিল্প-প্রতিভার বিশিষ্ট নিদর্শন।

হোয়ে যাওয়ার ভয়ে, দলে দলে আরও দক্ষিণে চোলে গেলো। মাদুরা জেলার কাম্বামভ্যালিতে বহুগ্রাম পত্তন কোরে তারা বসবাস কোরতে লাগল। এইখানে আম্মা-পট্টী নামে একটি গ্রাম বর্তমান। আম্মা শব্দের অর্থ মা—পট্টী হোলো পল্লী বা পাড়া। এককথায় মায়ের পল্লী। ১৯১৫ সালের ৭ই আগষ্ট পেরুমলদা এই মাদুরা জেলার আম্মাপট্টী গাঁয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

আম্মাপট্টী গ্রামে যে মায়ের মন্দির আছে, তাঁরই নাম অনুসারে এর নামকরণ।

গ্রামটির আধ মাইলের ভিতর ঠিক পুর্বে পেরিয়ার নদী আপন খেয়ালে বয়ে চোলেছে শান্তভাবে। ওপারে নারকেলের বাগান। চারদিকে উঁচু পাহাড় আর দুদিকে দিগন্ত প্রসারিত সবুজ ধানের ক্ষেত।

গ্রামের স্কুলে পেরুমলদাকে তামিল ভাষায় লেখাপড়া কোরতে হলেও ওঁদের বাড়ীতে মাতৃভাষা কানাড়া-ই ব্যবহার কোরতেন। কানাড়া হোলো মহীশুরের ভাষা। উত্তর ভারতে যেমন সংস্কৃত থেকে হিন্দী, বাংলা, গুজরাটী

মারাঠী ভাষার সৃষ্টি, তেমনি দক্ষিণ, ভারতে দ্রাবিড় ভাষা থেকে তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালায়ালম্ প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি।

পেরুমল শব্দের অর্থ এককথায় ঈশ্বর। তাঁর পিতা খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন। রোজ ভোরবেলা উঠে স্নান সেরে ঠাকুর পুজো কোরে জল গ্রহণ কোরতেন। মন্দির ও তীর্থ দর্শনেও খুব ঝোঁক ছিল। হরিকথা বা কীর্তণে তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম। পেরুমলদার মাও খুব ধর্ম-পরায়ণা মহিলা ছিলেন।

পেরুমলদার বয়স যখন চার পাঁচ বৎসর তখন তাঁর বাবা একটি তালপাতার অ-আ, ক-খ-র বই দেখিয়ে পুত্রের পাঠাভ্যাস করাতে লাগলেন। তারপর ছয় সাত বছর বয়সে পেরুমলদা গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হোলেন। পাঠশালার শিক্ষাদান প্রথাতে একটি বৈচিত্র্য ছিল। বালির উপর বোসে বালিতেই ছাত্রদের অ-আ, ক-খ, লিখে পাঠাভ্যাস কোরতে হোতো। প্রতি শনিবার অর্ধেক-দিন স্কুলের পর, প্রতিটি ছেলে সেই ঘরের বালিগুলিকে সরিয়ে ঘরের বাইরে ফেলে দিতো। তারপর মেঝেটিকে ভাল কোরে গোবর দিয়ে নিকিয়ে দিতো। আবার সোমবার স্কুলে আসার পর সবাই মিলে সারি দিয়ে কেউ ঝুড়ি, কেউ কাপড় কেউবা আবার টিনের বড় কৌটা নিয়ে—নদী থেকে মিহি বালি যে যার সাধ্যমত নিয়ে এসে, আবার স্কুলের মেঝেতে সেইভাবে বিছিয়ে দিতো। এইভাবে গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ কোরে উত্তমপালায়ম্ হাই স্কুলে গিয়ে ভর্তি হোলেন। সেখানে থেকেই প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।

পেরুমলদার শিল্পীজীবনের সূত্রপাত পাঠশালায় ছাত্রাবস্থাতেই। তখন থেকেই তিনি ছবি আঁকতেন। আর গুরুমহাশয়ও এতে খুব উৎসাহ দিতেন। গ্রামের কোনো লোক গুরুমহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরতে এলে তাদের বোলতেন "এই ছেলেটি খুব ভাল ছবি আঁকতে পারে।" বাচ্চাদের বইয়ে সাধারণত হাঁস, মুরগী, গরু, ভেড়া এসবের ছবি বেশী থাকে। সেইগুলিই তিনি যত্নসহকারে কপি কোরতেন। হাই স্কুলে তাঁদের যিনি ড্রইং শেখাতেন তিনি আবার ড্রিলও শেখাতেন। ঐ হাই স্কুলে পড়া কালীন নারায়ণ স্বামী চেট্টিয়ার নামে একজন কংগ্রেস নেতার সঙ্গে পেরুমলদার আলাপ হয়। তিনি তামিল ভাষার মাসিক পত্রিকা 'ভারতী'র সম্পাদক ছিলেন। হাই স্কুলে পেরুমলদার যখন শেষ বছর তখন নারায়ণ স্বামীর কাছ থেকে শান্তিনিকেতন ও গুরুদেবের কথা শোনেন এবং শান্তিনিকেতনে আসতে মনস্থ কোরলেন। প্রথমে পেরুমলদার মা বাবা আত্মীয় স্বজন সকলে দূরদেশ বোলে একটু ইতস্তত কোরলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর উৎসাহ ও ইচ্ছাই জয়ী হোলো।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার একমাস আগে, পেরুমলদা কলাভবনে দরখাস্ত কোরে দিলেন। নতুন উদ্যম ও উৎসাহে পরীক্ষা দিলেন। শেষদিন উত্তর এল "এখন কোন সিট্ নেই, ভর্তি হওয়া অসম্ভব। চিঠিটা পেয়ে ওঁর খুব মন খারাপ হোয়ে গেলো। চিঠিটা নারায়ণ স্বামীকে দেখালেন। তিনি বোললেন, "তুমি গিয়ে পড়ো তো, তখন দেখবে আর ফেরৎ পাঠাবে না।"

আশ্রম খোলার একমাস আগেই পেরুমলদা শান্তি-নিকেতনের পথে পাড়ি দিলেন। এই প্রথম তিনি ঘর থেকে বাইরে বেরোলেন একা। মাদ্রাজ পর্য্যন্ত বেশ এলেন, কোন রকম কষ্টই হোল না। আসতে আসতে একজন অন্ধ্র দেশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোলো। দুজনে কোলকাতায় নামলেন। পথের সঙ্গিটি তাঁকে একটা হোটেল দেখিয়ে বোললেন "ওখানে যেতে পারো।" পেরুমলদার পছন্দ হোলো না। সঙ্গীটিকে বোললেন "ওসব হবে না, আপনার ওখানেই যাবো'। তাঁর সঙ্গে গিয়ে সেখানে কিছু খেয়ে দেয়ে নিয়ে, হাওড়া ষ্টেশনে এলেন। এসে শুনলেন দুপুরের প্রথম গাড়িটা তখন ছেড়ে চোলে গেছে। কি করবেন, ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা কোরছেন। আর নানা রকমারী চিন্তাগুলো মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারছে। এমন সময় একজন ভদ্রলোক এসে আলাপ কোরে জিজ্ঞেস কোরলেন, আপনাকে দেখে মাদ্রাজী বোলে মনে হোচ্ছে। কোথায় দেশ? কোথায় যাবেন? এইভাবে নানা কথা তাঁকে শুধোতেই পেরুমলদা সব কথাই বোললেন। শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি: কোথায় উঠব, কি করব কিছুই জানি না। বোলপুর পৌঁছতেই অনেক রাত্তির হবে। এসব শুনে সেই ভদ্রলোক তাঁকে বোলেছিলেন যে

বোলপুরে আমার বন্ধু থাকেন, লোটন চন্দ্র ঘোষ, তিনি মিল্‌ওনার, আপনি আমার কাছ থেকে আসছেন শুনলে—আপনার আর বিশেষ কষ্ট হবে না।

পেরুমলদা ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়ে টিকিট কিনে গাড়ীতে উঠলেন। ছটা নাগাদ গাড়ী ছাড়ল। ঠিক ছাড়লো নয়, যেন কোন্ অজানা পথের সন্ধানে পৃথিবীর বুক চিরে ছুটে চোললো। বোল-পুরের কাছাকাছি যখন গাড়ীটা এসেছে তখন তিনি চিন্তা রতে লাগলেন, কি কোরে মিল্‌ওনারের বাড়িটা খুঁজে পাবেন। বোলপুরের তখন পরিবেশ অন্যরকম ছিল। াস্তিনিকেতনও তখন এতটা জম্‌জমাট হয় নি। আর বোলপুর শুধু তখন ব্যবসার চিন্তাতেই মগ্ন। রাস্তাঘাট চলাফেরার পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক ছিল না। বিজলি বাতির ঝল্‌মলানি ছিল না। সন্ধ্যে হোলেই চারিদিকে নেমে আসত গহন-কৃষ্ণ অন্ধকার। রাত্রে চারিদিকে একটা থম্‌থমে ভাব থাকত। কোথাও কোথাও একটা করে মিটমিটে কেরোসিনের আলো জ্বলত। লোকজনও ছিল খুব কম। বোলপুরে বেশ রাতে পৌঁছলেও এক সহৃদয় সহযাত্রীর কল্যাণে পেরুমলদাকে বিপদে পড়তে হোলো না। সহযাত্রীর সাহায্যে লোটন চন্দ্র ঘোষের খোঁজ পেলেন। যথেষ্ট আদর-আপ্যায়নের মধ্যে সেই রাত্রি কেটে গেল।

সকালে উঠেই রওনা হোলেন শান্তিনিকেতনের দিকে। শান্তিনিকেতনে পৌঁছে কলা ভবনের সামনে একজন বুড়োকে জিজ্ঞেস কোরলেন, "এই, গেষ্ট হাউস কোথায় বোলতে পার?" মাষ্টার মশায় তাঁর কাজের ঘরের সামনে কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে গল্প কোরছিলেন তাদের দেখিয়ে বুড়োটি বললো "ওখানে যান, বলে দেবে।" বুড়ো বুঝল—যে বাবুদের কাছে পাঠিয়ে দিলেই ঠিক খবর পাবে। পেরুমলদা এগোচ্ছেন ওঁদের দিকে, দেখলেন মাষ্টার মশায় চোলে গেলেন বাড়ির দিকে। তখন উনি একটি ছাত্রকে জিজ্ঞেস কোরলেন 'আচ্ছা'... কথাটি শেষ হোতে না হোতেই ছাত্রটি মাষ্টার মশায়কে দেখিয়ে বলল "ঐ যে নন্দলাল বোস যাচ্ছেন, ওঁর কাছে গেলেই সব ঠিক হোয়ে যাবে। ছাত্রটি বুঝল যে, এ নতুন ভর্তি হবে। পেরুমলদা মডার্ণ রিভিউতে মাষ্টার মশায়ের একটি লাইন ড্রইং দেখেছিলেন। দেখেই চিনতে পারলেন যে, ইনি নন্দলাল বোস। দেখলেন যে মাষ্টার মশায় ফুটবল গ্রাউণ্ড পার হোয়ে গুরু পল্লীর দিকে চোলে যাচ্ছেন। কি কোরবেন, পেছন থেকে ডাক দিতেও পারছেন না। দৌড়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াতেও পারছেন না। ভারী মুস্কিলে পড়েছেন। যাই হোক, মাষ্টার মশায়কে অনুসরণ কোরলেন। মাষ্টার মশায় বাড়ী পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরেই পেরুমলদাও গিয়ে মাষ্টার মশায়কে বোললেন "আমি মাদুরা থেকে এসেছি, ভর্তি হবো।" মাষ্টার মশায় শুনে বোললেন "বাড়ী থেকে রাগ-টাগ কোরে আসনি ত?" পেরুমলদা বোললেন, "না আমাকে বাড়িতে টেলিগ্রাম কোরে জানাতে হবে যে, আমি ভর্তি হোয়েছি।" মাষ্টার মশায় বোললেন, "বাড়িতে টেলিগ্রাম কোরে দাও যে, আমি ভর্তি হোয়ে গেছি।" মাষ্টার মশায় জিজ্ঞেস কোরলেন "খেয়েছ"? পেরুমলদা বোললেন "খেয়েছি সকালে।" মাষ্টার মশায় বোললেন "ওঃ সেত টিফিন কোরেছ। নাও আমার সঙ্গেই খেয়ে নাও আজ। আজ গান্ধীজির অনশন ভঙ্গের দিন।" মাষ্টার মশায় জিজ্ঞেস কোরলেন "আমিষ না নিরামিষ?" পেরুমলদা এটা আশ্রম ভেবে বোললেন, "এতদিন আমিষ ছিলাম এখন নিরামিষ হোয়ে যাবো।' মাষ্টার মশায় বোললেন "কোনো দরকার নেই।" খাওয়া দাওয়া শেষ কোরলেন। একটু বিশ্রামের পর মাষ্টার মশায় ওঁকে সঙ্গে নিয়ে কলা ভবন হোষ্টেলে গেলেন ছেলেদের সঙ্গে আলাপ কোরিয়ে দিতে। ছুটীর মাসটা ওদের সঙ্গেই থাকলেন। কলা ভবন খোলার পর ভর্তি হোয়ে গেলেন।

পেরুমলদার শিল্পশিক্ষার হাতেখড়ি হয় মাসোজীর কাছে। তিন মাস তাঁর কাছে শেখার পর বিনোদদার কাছে এবং তারপর মাষ্টার মশায় অর্থাৎ নন্দলাল বাবুর কাছে কাজ শিখতে লাগলেন। মাষ্টার মশায় যখন লাইব্রেরীর বারান্দায় ফ্রেস্কো কোরছেন তখন পেরুমলদা নিয়মিতভাবে যত্নের সঙ্গে তাঁর কাজ করা দেখতেন। পেরুমলদা যখন ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র তখন তেজপুর কংগ্রেস প্যাণ্ডেল ডেকরেট কোরতে মাষ্টার মশায় তাঁকে সঙ্গে নেন। ওখানকার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন কোরে

ফিরলেন। আবার যখন ফিফ্‌থ ইয়ারের ছাত্র তখন হরিপুরা কংগ্রেসের প্যাণ্ডেল ডেকোরেশন কোরতে মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে গেলেন। সেই সময় মাষ্টার মশায়কে সব সময় পেরুমলদা খুব কাছেই পেয়েছিলেন, একই তাঁবুতে পাশাপাশি তাঁদের থাকতে হোয়েছিল। মাষ্টার মশায়ের কাছ থেকে তিনি ভারতীয় শিল্প ও তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু আলাপ আলোচনা শুনেছিলেন। বিনোদ-দার কাছে কাজ করার সময় বহু নেচার ষ্টাডি কোরেছেন। বিশেষ কোরে পশু পাখির ছবি আঁকতে বেশি ভালো-বাসতেন। তা দেখে মাষ্টার মশায় ওঁকে ঐদিকেই উৎসাহ দেন। পেরুমলদা যখন থার্ড ইয়ারের ছাত্র, সে বছর পুজোর ছুটিতে হোষ্টেলের ছেলেদের শান্তি-নিকেতনসচিব জানিয়ে দেন যে, "এ ছুটিতে যারা হোষ্টেলে থাকবে তাদের পাঁচটাকা কোরে বেশী চার্জ্জ দিতে হবে। পেরুমলদা এবং তাঁর রুমমেট কিরণ সিন্‌হা প্রতিবাদ জানালেন। যাই হোক তাঁরা গোল-মালের ভেতর না গিয়ে ঠিক কোরলেন যে, ছুটিতে পায়ে হেঁটে, যতদুর সম্ভব বেড়াতে বেরোবেন। এইভাবে শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়ে ধানবাদ, বরাকর, মাইথন হোয়ে আবার হেঁটেই শান্তিনিকেতন ফিরেছিলেন বিচিত্র পরিবেশের নানা অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে সঙ্গে সম্বল ছিল মাত্র আনা কয়েক পয়সা।

শান্তিনিকেতনে শিল্প শিক্ষার কোর্স শেষ করার পর সিমলার হারকোর্ট বাট্‌লার স্কুলে একজন আর্ট টিচারের পদের জন্য মাষ্টার মশায়কে তাঁদের কর্তৃপক্ষ জানালেন। মাষ্টার মশায় পেরুমলদাকে পাঠালেন। সেখানে স্কুলের কাজ ভালো লাগলো না। এক সঙ্গে চল্লিশ পঞ্চাশজন ছাত্রদের হই হুল্লোড়ের ভেতর কাজ শেখাতে হোতো। তা ছাড়া স্কুলের সামগ্রীক শিক্ষা পদ্ধতি ও শাসন ব্যবস্থা তাঁর ভালো লাগছিলো না। অবশেষে তাই চাকরীতে ইস্তফা দিতে মনস্থ কোরলেন। মাষ্টার মশায়কে জানালেন। মাষ্টার মশায় জানালেন "ঠিক আছে, তুমি এখনি কাজ ছেড়ো না। ওয়ার্ধাতে আর একটা কাজ আছে, এসিস্‌টেণ্ট-কিউরেটারের পদ, ওখানকার কটেজ ইন্‌ডাষ্ট্রিজ্ মিউজিয়ামে। ওখানে আমি জে, সি, কুমারাপ্পাকে লিখে দিচ্ছি, তুমি ওখানে লেখালেখি করো। তা শুনে পেরুমলদা তাদের লিখলেন। কুমারাপ্পা তাকে লিখলেন 'আপনি চোলে আসতে পারেন, কিন্তু আমরা মাইনে ত বেশি দিতে পারবো না। জোর তিরিশ টাকা মাইনে দেবো। পেরুমলদা রাজী হোয়ে গেলেন। কিন্তু যাওয়ার সময় শান্তিনিকেতন হোয়ে যাবেন স্থির করলেন। ইতিমধ্যে মাষ্টার মশায় তাঁকে টেলিগ্রাম কোরে জানালেন "ষ্টার্ট ফর শান্তিনিকেতন।" পেরুমলদা মাষ্টার মশায়ের সঙ্গেই দেখা কোরতে আসছিলেন। শান্তিনিকেতনে আসতেই মাষ্টার মশায় বোললেন "এখানেই কাজ রোয়েছে, এখানেই থেকে যাও।"

পেরুমলদা ওয়ার্ধাতে চাকুরি নেওয়ার কথা জানালেন। মাষ্টার মশায় বোল্লেন, "ঠিক আছে, আমি কুমারাপ্পাকে লিখে দেবো।" মাষ্টার মশায়ের চিঠি পেয়ে কুমারাপ্পা লিখলেন "ঠিক আছে, আপনার লোক আপনি রাখবেন তাতে আমি কি জোর করতে পারি? যাই হোক পেরুমলদা শেষ পর্য্যন্ত শান্তি নিকেতনেই থেকে গেলেন।

প্রথমে তিনি কলাভবনে মিউজিয়ামের কিউরেটর হোয়ে কাজ কোরতে লাগলেন। আর অবসর সময়ে

ছেলেদের কাজ শেখাতে লাগলেন। এর দু এক বছর পরেই কলাভবনের শিক্ষকতার কাজ পেলেন। ১৯৩৯ সালে প্রথম মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে বরোদায় গেলেন ফ্রেস্কো কোরতে। আবার ১৯৪৬ সালে শেষবার যখন মাষ্টার মশায় ফ্রেস্কো কোরতে বরোদায় যান তখনও তিনি সঙ্গে গিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে কামারপুকুরের মন্দিরের প্ল্যান কোরতে যখন মাষ্টার মশায় গিয়েছিলেন তখনও পেরুমলদা তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তারপর মাষ্টার মশায় মন্দিরের প্ল্যানটি স্কেচ্ কোরে পেরুমলদাকে দেন। পেরুমলদা তাকে আবার স্কেলে কোরে দেন। সেই থেকে ঐ ভাবেই তিনি কলাভবনের শিক্ষকতার কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে কোরে চোলেছেন। আজ তিন বৎসর যাবৎ উনি কলাভবনের লেক্চারারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

আচার্য নন্দলালের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভের ফলে পেরুমলদার জীবনে ও কাজে—তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বলা যায় পেরুমলদা, নন্দলালের একলব্য শিষ্য। শিক্ষক হিসাবেও পেরুমলদার তুলনা নেই। অত্যন্ত যত্ন ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি ছাত্রদের কাজ শেখান। শিল্পীমন ও শিক্ষক প্রাণ—এই দুয়ের সার্থকসমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক পেরুমলদা দীর্ঘায়ু হোয়ে ভারতীয় শিল্পকে নিত্য নতুন সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যান, এই কামনা কোরে বর্তমান নিবন্ধের উপসংহার টানছি।

রংএর রকেটে চোড়ে
পাখসাট মারে
ভাব্‌নাগুলো
—কোন্ চন্দ্রের উদ্দেশ্যে ?

ভীষণ ধাক্কায়
জ্যোৎস্নালোকের
ঝড় ওঠে।

সিগ্‌ন্যাল হয়
পৃথিবীর রেডিওয়ে...

জয় ! পৃথিবীর জয় !

শিল্পী স্বপ্ন দেখে
ফালি চাঁদের !
—গরুর গাড়ি চোড়ে
চোলেছে সে কোনার্কের পথ !

—হায় সে পুরোনো দিন গুলো।

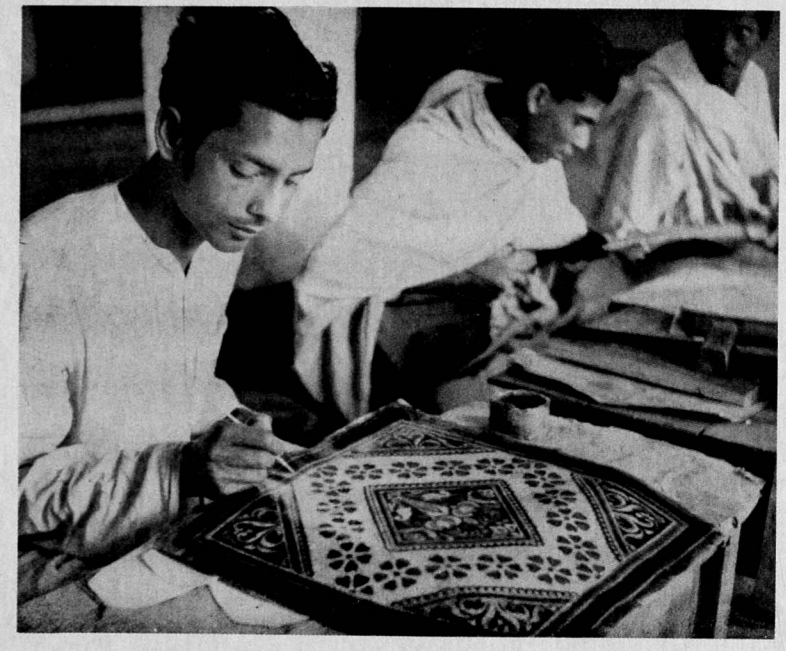

হাতের কাজে নিমগ্ন শিল্পীরা।

পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্প

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

নানান পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন। আলোক চিত্র-শিল্পী হিসাবেও খ্যাতি আছে। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান—'চলোমির' সম্পাদক।

'হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট্‌স' কথাটির বাংলা হলো হস্তশিল্প। এক কথায় বলা যায় হাতে তৈরী জিনিস। বিভিন্ন ধরনের যেসব জিনিস হাতের সাহায্যেই কোরতে হয়, মেসিনে তৈরী হয় না—তাদেরই হস্তশিল্প বলা হয়। হস্তশিল্প-জাত দ্রব্যাদি মেসিনে তৈরী না হোলেও কিছু কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদির জন্যে ভারতবর্ষের খ্যাতি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হস্ত-শিল্পের বিভিন্ন ধারা দেখতে পাওয়া যায়। এক একটি রাজ্যে কয়েক শ্রেণীর হস্তশিল্পের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ কোরে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে হস্তশিল্পের উল্লেখ আছে; এ থেকেই বোঝা যায়, যে এই শিল্পধারা ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকেই চোলে আসছে। প্রাচীন যুগে গ্রামবাসীরা জমি চাষ কোরে বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সেরে অবসর সময়ে নিজেদের সংসারের দরকার মতো জিনিসপত্র হাতে তৈরী কোরে নিত। অবশেষে তারা দক্ষতা অর্জন কোরে কিছু বাড়তি জিনিসও তৈরী কোরতো এবং সেগুলি গ্রামের অন্যান্য পরিবারের ব্যবহারে লাগত। এইভাবে হস্তশিল্প ধারার প্রবর্তন হয়। ক্রমে কাপড় বোনার তাঁতি, মাটির জিনিসপত্র তৈরী করার জন্যে কুমোর, কাঠের কাজকর্ম করার জন্যে ছুতোর মিস্ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন হস্তশিল্পী-শ্রেণী গড়ে ওঠে। গ্রামীণ ভারতে তারা বিশেষ কোরে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রই তৈরী কোরতো; কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন শিল্প সম্বন্ধে সচেতন হওয়ায় হস্তশিল্পজাত নানান জিনিস দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়াও সুরুচি-সম্পন্ন গৃহের অঙ্গসজ্জার উপকরণ হিসাবেও এর জনপ্রিয়তা আজ ক্রমবর্ধমান।

জানা যায় যে মৌর্যদের রাজত্বকালে হস্তশিল্পের বিশেষ উন্নতি ও প্রসার হোয়েছিল এবং সেই সময় শিল্পীদের কাজও খুব উন্নত পর্যায়ের হোতো। মুসলমান সম্রাটদের রাজত্বকালে ঢাকায় মসলিন নামে একটি বিশেষ ধরনের কাপড় সূক্ষ্মতম সুতোয় বোনা হোতো। এই ঢাকাই মসলিনের সূক্ষ্মতা ও চমৎকারিত্বের খ্যাতি কেবল ভারতবর্ষেই নয়, সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো বাংলাদেশও (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ) বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পে বেশ উন্নত। এক একটি কোরে আলোচনা করা যাক।

তাঁতে বোনা কাপড় ও সিল্ক—

এই শিল্প পশ্চিমবঙ্গের কুটীরশিল্পের মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গে এমন গ্রাম খুব কমই আছে যেখানে তাঁত নেই। অন্ন ও বস্ত্র দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য, তাই বস্ত্র উৎপাদনে তাঁতের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। তাঁতে বোনা শাড়ি যে কেবল টেঁকসই হয় তা নয়, সেগুলির নক্সার বৈচিত্র্য এবং বর্ণ সুষমার বৈচিত্র্যও ব্যবহার-কারীদের মুগ্ধ করে। তাঁতে বোনা ধুতিও বেশ টেঁকসই এবং মর্যাদাপূর্ণ হয়। মুর্শিদাবাদের তাঁতীরা প্রায় ষাট বছর

তাঁতে তৈরী গদ্দার কয়েকটি নমুনা।

আগেও তিরিশটি ভিন্ন ভিন্ন রকমের সিল্ক বুনত। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাঁতীরা বিভিন্ন রকমের ধুতি ও শাড়ি বোনে। তাঁতে বোনা এইসব নানা ধরনের কাপড় ও ছিট আজকাল এদেশে ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আদর পাচ্ছে। সুন্দরভাবে বোনা, বিভিন্ন নয়নলোভন নক্সা এবং মনোমুগ্ধকর বর্ণ-সামঞ্জস্য প্রভৃতি গুণাবলীর জন্যেই তাঁতে বোনা (হ্যাণ্ডলুম) কাপড়ের চাহিদা ক্রমশঃই বাড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গের সিল্ক-শিল্প বেশ প্রাচীনকাল থেকে চোলে আসছে। সিল্কের কাপড়, টেঁকসই হয়, অথচ দেখতে সুন্দর ও বর্ণোজ্জ্বল। সুরুচিসম্পন্ন সৌখীন ব্যক্তিরাই সিল্ক বেশি ব্যবহার করেন। সিল্কের ছাপা শাড়ি আধুনিকাদের বিশেষ পছন্দ। বহু রঙের বহু বিচিত্র নক্সায় অলংকৃত ছাপা সিল্ক শাড়ি পাওয়া যায়। এগুলি দেখতেও যেমন সুন্দর, ব্যবহারেও তেমনি আনন্দ। শার্ট, পাঞ্জাবী ও স্যুট-এর জন্যেও সুন্দর সিল্ক পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মুর্শিদাবাদই সিল্ক-এর জন্যে বিখ্যাত।

সম্প্রতি বয়নশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য লুপ্ত ধারা পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হোয়েছে। সেটি হলো 'জামদানী শাড়ি।' পূর্ববঙ্গের তাঁতীদের কৃতিত্বের অন্যতম নিদর্শন ছিল এই জামদানী শাড়ি। জামদানী শাড়ির বয়ননৈপুণ্য ও নক্সার চমৎকারিত্ব দেশে ও বিদেশে বিশেষ খ্যাতিলাভ কোরেছিল। বেনারসের বিখ্যাত বেনারসী শাড়ির সঙ্গে জামদানী শাড়ি অনায়াসে তুলনীয়। জ্যামিতিক কতোগুলি আকারকে অবলম্বন কোরে নক্সা আঁকা এই শাড়ির বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে কিছু তাঁতীকে এই বিশেষ শাড়ি তৈরীর কাজে শিক্ষা দেওয়ার পর তারা এখন আগের মতো জামদানী শাড়ি বুনতে পারছে এবং বর্তমানে বিভিন্ন নক্সার ও রঙের এই শাড়ি আবার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

। হাতের কাজের নানান নমুনা ।

দার্জিলিং-এর একদল অধিবাসী সাদা ও নীল রঙের সুতো দিয়ে এক ধরনের মোটা চাদর বোনে। সেগুলি বেশ মজবুত এবং দেখতেও ভাল হয়। দার্জিলিং-এর ভুটিয়া অধিবাসীরা এবং নেপালের অধিবাসীরা পশমের বেশ ভাল কম্বল বুনতে পারে। তারা প্রথমে সরু সরু ফালি বুনে নেয় এবং পরে কয়েকটি ফালি বুনে জুড়ে নিয়ে বেশ বড় কম্বল তৈরী করে।

হাতির দাঁতের কাজ—

হস্তশিল্পজাত জিনিসের মধ্যে হাতির দাঁতের তৈরী শিল্পসামগ্রী গুলিই সবচেয়ে বেশি প্রশংসনীয়। হাতির দাঁতের কোন সুন্দর জিনিস তৈরী কোরতে হোলে শিল্পীর বিশেষ দক্ষতা, সূক্ষ্ম শিল্প-জ্ঞান, প্রখর দৃষ্টি এবং যথেষ্ট ধৈর্যের প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মুর্শিদাবাদ এবং কোলকাতার শিল্পীরা হাতির দাঁতের কাজে সূক্ষ্ম অলংকরণের জন্যে বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদে তৈরী কয়েকটি হাতির দাঁতের কাজের নিদর্শন সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামে আছে। সেগুলি হাতির দাঁতের শিল্পকর্মের খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিদর্শন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে,শিল্পীরা প্রধানত প্রাচীন মহাকাব্য ও প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে হাতির দাঁতের জিনিস তৈরী করে। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিও তারা তৈরী করে। কতকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিসও হাতির দাঁত দিয়ে তৈরী হয়! হাতির দাঁতের তৈরী জিনিসগুলির দাম বেশি হোলেও তা অকারণ নয়। উপহারদ্রব্য হিসাবে হাতির দাঁতের জিনিস সত্যিই অতুলনীয়।

মাটির খেলনা ও পুতুল—

হস্তশিল্পের এই সাধারণ ক্ষেত্রটিতে পশ্চিমবঙ্গ বিশিষ্ট স্থান অধিকার কোরে আছে। প্রাচীন কাল থেকেই মাটির নানা মূর্তি, খেলনা ও পুতুলের ধারা এদেশে চোলে আসছে। বর্তমানে কোলকাতা থেকে মাত্র বাষট্টি মাইল দূরে অবস্থিত কৃষ্ণনগর এই শিল্পধারার স্থান। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক হোলেও মৃৎশিল্পে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী। তাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, শিল্পকৃতি, সর্বোপরি কোন আকৃতি বা মূর্তির রূপদানে আন্তরিকতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গুণগুলির জন্যে তাদের তৈরী জিনিসগুলি অত্যন্ত জীবন্ত হয় এবং তা সকলেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণত মৃৎশিল্পীরা দেবদেবীর মূর্তি তৈরী করে; কিন্তু তা ছাড়া রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের মূর্তি, গ্রাম্যজীবনের নানা মূর্তি এবং পশুপাখী, ফলমূল ইত্যাদিও তৈরী করে। জিনিস অনুপাতে এগুলির দামও কম বা বেশি হয়। বহু বিদেশীকেও এইসব জিনিস আকৃষ্ট কোরে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে কাঠের খেলনা, পুতুল বা ঐ জাতীয় জিনিসও যথেষ্ট তৈরী হয়। কাঠের তৈরী বোলে খেলনাগুলি সহজে ভাঙ্গেও না।

চামড়ার নানা জিনিস—

পশ্চিমবঙ্গে ইদানীং চামড়ার তৈরী অত্যন্ত সুন্দর নানা জিনিস বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এগুলির বেশ চাহিদাও হোয়েছে.বিশেষ কোরে সৌখীন সম্প্রদায়ে। চামড়ার তৈরী জিনিসের মধ্যে মানি-ব্যাগ, মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ, শপিং ব্যাগ, বই, খাতা বা এ্যালবামের মলাট, চশমার খাপ, পোর্টফোলিও, কুশন ও মোড়ার কভার, জুতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সাধারণ চামড়ার জিনিসের চেয়ে এগুলির দাম কিছু বেশি; কারণ নানা ডিজাইনের, নানা রঙের এবং শিল্পসুষমামণ্ডিত করার জন্যে এগুলি তৈরী কোরতে খরচও বেশি পড়ে। সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এবং বিশেষ কোরে মহিলারাই এই সব জিনিসের পক্ষপাতী। বোলপুরের শ্রীনিকেতনে চামড়ার কাজের একটি বিশেষ বিভাগ আছে; তাছাড়া আজকাল আরও অনেক প্রতিষ্ঠানে এই বিভাগ খোলা হোয়েছে। আজকাল অনেক বাড়ীতে ছেলে বা মেয়েরাও চামড়ার নানা হাতের কাজ কোরছে। বর্তমানে প্রায় ত্রিশ হাজার শিল্পী চামড়ার এইসব জিনিস তৈরীর কাজে নিযুক্ত। বিদেশী বাজারেও চামড়ার এইসব জিনিসের বেশ চাহিদা হোচ্ছে।

বাঁশ ও বেতের কাজ—

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কোরাঙ্গরা এবং কিছু

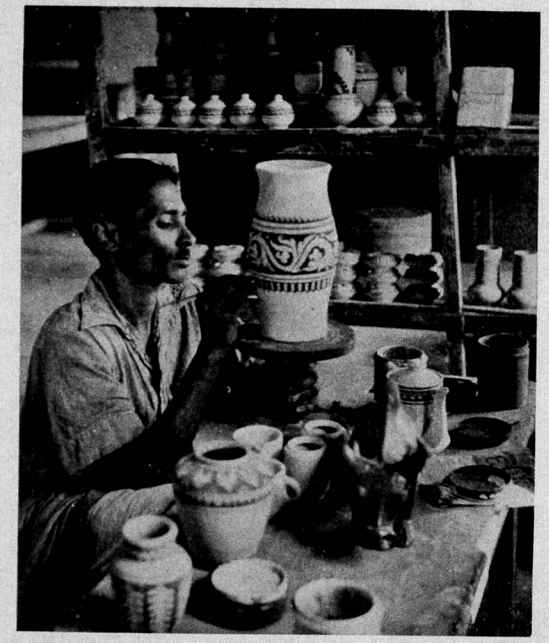

পশ্চিমবঙ্গে মৃৎপাত্র শিল্পের একটি কেন্দ্র। মৃৎপাত্রে অলঙ্করণরত শিল্পী।

আদিবাসী পরিবার বাঁশ ও বেত দিয়ে বহুরকম সুন্দর প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী কোরে থাকে। এরা ছাড়া, যাদের ডোম বলা হয়, তাদের মধ্যেও অনেকে বাঁশ ও বেতের নানা জিনিস তৈরী কোরে থাকে। আজকাল প্রয়োজনীয় বাঁশ ও বেতের তৈরী জিনিসগুলিকে নানা নক্সা ও রঙের ব্যবহারে শিল্পশ্রীমণ্ডিত কোরে তোলা হোচ্ছে। বাঁশ ও বেত দিয়ে যেসব জিনিস তৈরী হয়, তার মধ্যে ফুলদানী, পাউডারের কৌটো, টেব ল ল্যাম্প, সিগারেট কেস, টেব্‌ল, চেয়ার, দোলনা, মোড়া, ঝুড়ি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মাদুর শিল্প—

পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্পটি বহুদিন থেকে চোলে আসছে। মুসলমান রাজত্বকালে এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি হোয়েছিল। এই সময়ে সিল্কের সুতো দিয়ে মাদুর বোনা হোতো। সবচেয়ে ভালো মাদুরকে 'মসলন্দ' বলা হোতো এবং সাধারণ ধরনেরগুলিকে মাদুরই বলা হোতো। সাধারণ মোটা ধরনের মাদুর মেঝেতে ব্যবহৃত হয় এবং সরু ও সুন্দর মসলন্দ জাতীয় মাদুর ধনী শ্রেণীর পরিবারে বিছানার ওপর পেতে ব্যবহার করা হয়। মাদুরের শিল্পে পশ্চিমবঙ্গে বহু লোক জীবিকা অর্জন করে।

শঙ্খ ও শিং শিল্প—

শাঁখ থেকে তৈরী নানা জিনিস এবং গরু ও মোষের শিং থেকে তৈরী নানা জিনিসের শিল্পও উল্লেখযোগ্য। এই শিল্পে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বারো হাজার শিল্পী নিযুক্ত। শাঁখের তৈরী শাঁখা বাংলাদেশের কেন, অন্যান্য জায়গায়ও হিন্দু নারীদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শাঁখা ছাড়াও শাঁখের অন্যান্য প্রয়োজনীয় অথচ সুন্দর জিনিসও তৈরী হয়। যেমন—ফুলদানী, কানের দুল, ছাইদানী, টেবল্ ল্যাম্প, বোতাম, কলমদানী প্রভৃতি। শাঁখের জিনিস যাঁরা তৈরী করেন তাদের 'শাঁখারী' বলা হয়।

গরু ও মোষের শিং থেকেও দোয়াত, কলম, বোতাম প্রভৃতি জিনিস তৈরী হয়। তাছাড়া শোলা, এবং বিভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরী বহু প্রয়োজনীয় অথচ সুন্দর জিনিসও শিল্পীরা তৈরী কোরে আসছেন।

ভারতীয় হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে তাই পশ্চিমবঙ্গ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। এদেশে তৈরী জিনিসগুলি মধ্যে প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সৌন্দর্যের সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরনের অধিকাংশ জিনিস দেখলেই শিল্পীর রুচি ও সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যন্ত্রের সাহায্যে তৈরী জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হাতে তৈরী জিনিসপত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে কতখানি সাফল্য অর্জন কোরতে পারবে, তা অবশ্য বলা কঠিন। কারণ, যন্ত্রের সাহায্যে একসঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে কোন একটি জিনিস তৈরী হোতে পারে এবং তাতে দামও অনেক সস্তা হবে, কিন্তু হাতে তৈরী কোরলে একসঙ্গে ঐ সময়ের মধ্যে পরিমাণে বেশী জিনিস তৈরী করা সম্ভব নয়, তাই সেগুলির দামও কিছু বেশী হবে। তাই এক্ষেত্রে আমাদের দেশবাসী যদি অধিক সংখ্যায় হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদির বিশেষ মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হোয়ে এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহলেই হস্তশিল্পের প্রবহমান প্রাচীন ধারা এবং এই শিল্পে নিযুক্ত অসংখ্য শিল্পীরা বাঁচাতে পারে।

আনন্দের বিষয় যে, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার হস্তশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা কোরছেন। ভারত সরকার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের (মিনিষ্ট্রী অফ কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী) অধীনে নিখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ড (অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট্‌স্ বোর্ড) নামে বিশেষ একটি বিভাগ সৃষ্টি কোরছেন। তাঁরা এদেশে এবং বিদেশে হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি জনপ্রিয় কোরে তোলার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা কোরছেন। এই প্রচেষ্টায় তাঁরা কিছু কিছু সাফল্যও অর্জন কোরেছেন; এদেশে রুচিশীল বহু পরিবার আজকাল প্রয়োজনীয়তার জন্যে অথবা প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও কেবলমাত্র গৃহসজ্জার জন্য হস্তশিল্পজাত নানা দ্রব্যাদি ব্যবহার কোরছেন।

ভারতের বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এগুলির বেশ চাহিদা হোচ্ছে। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যাপারে বেশ সাহায্য হবে। হস্তশিল্পে পশ্চিমবঙ্গের দানও কম নয়। বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয় যে, ক্রমশঃ হস্তশিল্পের আরও উন্নতি ও প্রসার সম্ভব হবে। তবে এই ব্যাপারে আমাদের দেশের লোকের পৃষ্ঠপোষকতা সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

প্রাক্-বৃটিশ ভারতে নগর পরিকল্পনা

জীবেন্দ্র কুমার গুহ

শিল্প-কলা ও সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ অনুরাগী। শিল্প-সমালোচক হিসেবে সম্মান-যোগ্য। পত্র-পত্রিকায় এঁর প্রতিষ্ঠিত প্রবন্ধের নিদর্শন প্রায়ই পাওয়া যায়। সুন্দরম্-এ আউটরাম-এর মূর্তি অপসারণ সম্পর্কে এঁর আলোচনা উল্লেখযোগ্য।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, একা-একা সে থাকতে পারে না। এভাবে প্রথমে গ্রাম এবং পরে শহর গড়ে উঠেছে। এই জনপদগুলিও খাপছাড়া ভাবে গড়ে ওঠে নি। সামাজিক রীতিনীতি, নিরাপত্তাবোধ ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ওপরে প্রতিটি নগর পরিকল্পনা নির্ভরশীল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ইতিহাসের সুরু থেকে ভারতেও অনেক নগরের পত্তন হোয়েছে। ক্রমশ গড়ে উঠে তাদের অনেকগুলিই হয়তো আজ ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হোয়ে গেছে—প্রাকৃতিক কারণ, যেমন ভূমিকম্প বা জলপ্লাবনে এবং রাজনৈতিক কারণেও বটে।

প্রাক্-বৃটিশ আমলে ভারতে নগর পরিকল্পনার ঐতিহাসিক ধারা-বিবরণী আরম্ভ করতে হয় মহেনজোদাড়ো থেকে। ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে নগর পরিকল্পনার মোটামুটি যে ছক সেখানে পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় শহরের বুক চিরে রাস্তাগুলি সোজা বেরিয়েছিল এবং তার দুপাশে বাড়ী অধিকাংশই দাঁড়িয়েছিল একটার গায়ে আর একটা। সে যুগের বিত্তবানদের বাড়ীতে বাগান ছিল কিনা, তা বুঝবার এখন কোন উপায় নেই। আমরা যতটুকু জানি তাতে মহেনজোদাড়োর বাড়ীগুলিকে ঠিক প্রচলিত অর্থে ঘিঞ্জি বলা যায় না—যেভাবে ভারতের অনেক প্রাচীন শহরের (যেমন কাশী, আগ্রা, দিল্লী বা লাহোর) পুরনো পাড়ার বাড়ীগুলিকে বলা চলে। তবে যতদূর বোঝা যায় মহেনজোদাড়োর বাড়ীগুলি খুব সম্ভব এতটা বিশ্রী ছিল না এবং তার নগর পরিকল্পনার পরিমাণে বেশি না হলেও কিছুটা স্পেশাস্‌নেস্ ছিল।

মহেনজোদাড়ো অবশ্য বহুদিন হলো ধ্বংস হোয়েছে। আজ থেকে প্রায় ৪০০০/৪৫০০ বছর আগে—সম্ভবত বারকয়েক বিদেশী শত্রুর আক্রমণে এবং বোধ হয় সিন্ধু-নদের প্লাবনে। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে মহেনজোদাড়োর অববলুপ্তির পর ভারতে আর্যদের প্রতিপত্তি শুরু হয়। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া উচিত। এখনও পর্যন্ত যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে সেগুলি বিশ্লেষণ কোরে পণ্ডিতেরা বলেন যে মহেনজোদাড়োর আদিম অধিবাসীরা খুব সম্ভব আর্য গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না। ভারতে প্রাচীন আর্য সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি তাথেকে অনুমান করি যে তাঁরা মুখ্যত গ্রামবাসী এবং কৃষিজীবী ছিলেন।

এই সময়কার (খৃঃ পূঃ ২০০০-৫০০) নগর সংক্রান্ত ধ্বংসাবশেষ ভারতে নেই বোললেই চলে। ইদানীং কিছু খোঁড়া-খুঁড়ির ফলে পশ্চিম ও মধ্য ভারত ও রাজস্থানের কয়েকটি জায়গায় প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আশা করেন যে এ সব জায়গায় হয়ত তাঁরা মহেনজোদাড়োর পরবর্তী সময়ের শহরের খোঁজ পেতে পারেন।

যাই হোক আমাদের আলোচনায় একথা ধরে নেওয়াই ভাল যে নিশ্চিতভাবে এ সময়ের কোন শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও এরকম পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায়নি যা থেকে তৎকালীন নগর পরিকল্পনা সম্পর্কে একটা সুনিশ্চিত ধারণা হয়।

কাশী, দিল্লী বা অন্যান্য প্রাচীন শহরের পুরনো অংশগুলি বেশ প্রাচীন। আমার ধারণা যে, এসব

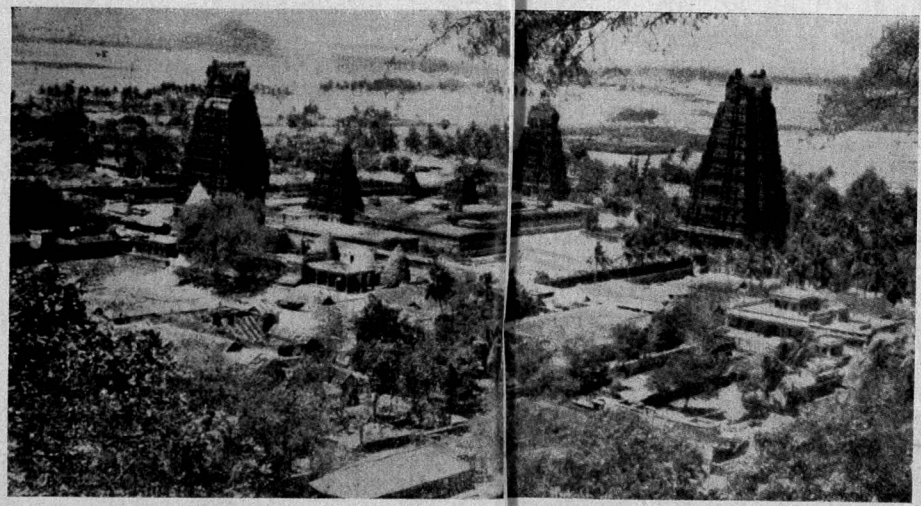

দক্ষিণ ভারতের মন্দির শোভিত একটি নগর।

শহরের পুরনো মহল্লার যে চেহারা এখন আমরা দেখি সন-তারিখ মতে তার বয়স যদিও বেশি নয়—হয়ত ২০০।৩০০ হবে—কিন্তু তার কাঠামোটা বোধ হয় বেশ পুরনো—২০০০।১৫০০ বছর হওয়াও কিছু অসম্ভব নয়।

এখন এসব শহরের পুরনো পাড়াগুলির চেহারাটা কি? একথা অনস্বীকার্য যে যদিও লিথোগ্রাফ, উড্‌কাট, এচিং ইত্যাদি গ্রাফিক আর্টের মারফৎ এসব গলি-ঘুঁজি, পুরনো পড়ো বাড়ী সম্বন্ধে আমাদের বেশ একটু রোমান্টিক ভাবালুতা থাকলেও বসবাসের পক্ষে এগুলি কিন্তু বিশেষ সুবিধের নয়। মনে রাখা উচিত যে মানুষের বসবাসের সুখ-সুবিধা অনুসারেই নগর পরিকল্পনা গড়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে সব জায়গার স্থাপত্যও। সাধারণভাবে বোলতে গেলে উত্তর ভারতের কোনো প্রাচীন শহরের পুরনো মহল্লাই বেশ খোলামেলা নয়। এখানে জয়পুরের কথা উল্লেখ করিনি এই কারণে যে ওই শহরটির বর্তমান চেহারা পুরনো নয়। মাত্র দু'শ বছর বয়স।

উত্তর ভারতের শহরের পুরনো মহল্লাগুলি খুব ঘিঞ্জি হলেও দক্ষিণ ভারতীয় শহরের পুরনো পাড়াগুলি কিন্তু ওরকম নয়। তাদের ঠিক 'ছিম-ছাম' যদিও বা না বলা যায় তবুও ঘিঞ্জি তো নিশ্চয়ই নয়। কাঞ্চীর কথাই ধরুণ। খুবই পুরনো শহর। কাশীর চেয়ে তার বয়সও কিছু কম নয়। কাঞ্চী দুভাগে ভাগ করা—শিব ও বিষ্ণু কাঞ্চী। ওখানকার প্রাচীনতম মন্দির হোলো কৈলাসনাথের (খৃঃ ৮ম শতাব্দী) সে মন্দিরে যে পাড়ায় বা যে রাস্তা দিয়ে যেতে হয় তা মোটেই ঘিঞ্জি নয়। যদি বলেন যে মন্দিরটি বর্তমান শহরের একটু বাইরে, তবুও বোলব যে কাঞ্চীর প্রায় সর্বত্র প্রাচীন মন্দির ছড়ান। শিব বা বিষ্ণু কাঞ্চীর কোন পাড়াই উত্তর ভারতীয় পুরনো শহরের মতো ঘিঞ্জি নয়। দক্ষিণ ভারতের আর একটি শহর হলো মহাবলীপুরম। খৃঃ ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীতে অথবা তার কিছু আগেই এর পত্তন সুরু হোয়েছে। এখন অবশ্য মহাবলীপুরমে লোক-বসতি না থাকলেও—কয়েকটি বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির শুধু আছে—একথা মনে হয় না যে পল্লবদের রাজত্ব-কালেও জায়গাটি খুব ঘিঞ্জি ছিল। যেদিকে রথগুলি আছে বা সমুদ্রের ধারে যে মন্দিরটি একক দাঁড়িয়ে আছে,

নগর পরিকল্পনায় মুসলিম যুগের একটি তোরণ

শহরের (এখন গ্রাম) এই দুদিকে ঘুরলেই আমার বক্তব্য বোঝা যাবে।

এখন আলোচ্য বিষয় হলো যে উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যে নগর পরিকল্পনার মধ্যে এই ধরনের পার্থক্য দেখা দিল কেন? মহেনজোদাড়োর সঙ্গে পরবর্তী উত্তর ভারতীয় শহরগুলির পরিকল্পনায় কোনো মিল নেই। একথা স্পষ্ট যে অন্তবর্তীকালে এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার ঘটেছিল যার ফলে আর্যাবর্তের লোকেরা তাঁদের নগর পরিকল্পনায় বেশ বড় রকমের অদল-বদল কোরেছিলেন বা কোরতে বাধ্য হোয়েছিলেন। অথচ দেখা যাচ্ছে যে দাক্ষিণাত্যে মহেনজোদাড়োর রীতি মোটামুটি অব্যাহত রয়েছে। কি জন্যে এরকম হলো?

উত্তর ভারতে নগর পরিকল্পনার এই পরিবর্তন এত গুরুতর যে এর বিশদ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অথচ আমি যতদূর জানি এ বিষয়ে এ পর্যন্ত বিশেষ কোনো আলোচনা হয়নি। এখানে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিমত পেশ করছি, পণ্ডিতেরা যদি এ বিষয়ে তাঁদের

মত দেন তবে অনুগৃহীত হব।

মহেনজোদাড়োর বাসিন্দারা কোন্ জাতের বা রেস্-এর মানুষ ছিলেন এ বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখন পর্যন্ত সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছেন বোলে মনে হয় না। তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ এই রকম মনে করেন যে এই সময়ে (খৃঃ পূঃ ২০০০-১৫০০) এখন যাদের আমরা 'আর্য' বোলে জানি তাঁরা জাগতিক সভ্যতার মাপকাঠিতে (নগর পরিকল্পনাও এর একটা অংশ) মহেনজোদাড়োর অধিবাসীদের তুলনায় অনেকটা হীন ছিলেন। এই আর্যেরা (বোধ হয়) কয়েক শতাব্দী ব্যাপী পর-পর কয়েকবার মহেনজোদাড়োর ওপর আক্রমণ চালান এবং শেষ পর্যন্ত শহরটি ধ্বংস হয়। শহরটি ধ্বংস হবার অবশ্য আরও একটি কারণ ছিল সেটি হোচ্ছে সিন্ধু নদের পৌনঃপুনিক বন্যা।

পণ্ডিতেরা আরও অনুমান করেন যে মহেনজোদাড়োর প্রাচীন অধিবাসীরা দ্রাবিড় বংশীয় এবং ওই শহরটি ধ্বংসের পর তাঁরা দাক্ষিণাত্যে চলে যান এবং এখনও পর্যন্ত সেখানেই বাস কোরছেন। মনে হয় দাক্ষিণাত্যের নগর পরিকল্পনা এঁদের গড়া বলে মহেনজোদাড়োর রীতিতেই দক্ষিণী শহরগুলি তৈরী হোয়েছিল এবং সে কারণে উত্তর ভারতের মতো ঘিঞ্জি হয়নি। মহাভারতে ময়দানবের স্ফটিকগৃহ নির্মাণের উল্লেখে একথাই বোধ হয় ইঙ্গিত করা হোয়েছে যে অনার্যেরা আর্যদের চেয়ে বাস্তু বিদ্যায় অনেক বেশি পারদর্শী ছিলেন।

এ ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নগর পরিকল্পনায় পার্থক্যের একটি গুরুতর কারণ আছে বোলে মনে করি। একথা সবাই জানেন যে প্রায় ৫০০ খৃঃ পূর্বাব্দ থেকে একটানা প্রায় ২০০০ বছর ধরে উত্তর ভারতে উত্তর পশ্চিমদিক থেকে পুনঃপুনঃ বিদেশী আক্রমণ চালান হোয়েছিল। পারসীক, গ্রীক, শক, কুষাণ, হূণ, পাঠান, মোগল—এরাই প্রধানত এইসব আক্রমণ চালিয়ে ছিলেন। এর ফলে উত্তর ভারতের অনেক প্রাচীন শহর, যেমন মথুরা কনৌজ, কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি এসব একেবারে ধ্বংস হোয়ে গেছে। দাক্ষিণাত্যে এ ধরনের ব্যাপক আক্রমণ হয়নি। ওখানে বড় আক্রমণ তিনবার হোয়েছিল—আলাউদ্দীন খিলজী, আওরঙ্গজেব, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বাহমনি রাজাদের আক্রমণ। এর মধ্যে আলাউদ্দীন ও আওরঙ্গজেবের আক্রমণ ঠিক সর্বাত্মক ছিল না। বলা যেতে পারে খানিকটা বিক্ষিপ্ত, তবে বিজয়নগর সাম্রাজ্য একেবারেই ধ্বংস হয় এবং তার রাজধানী হাম্পি ধূলিসাৎ হয়। এখানে আমার বক্তব্য হলো এই যে উত্তর ভারতের তুলনায় দাক্ষিণাত্যে বিদেশী অভিযানকে

কাশী বা বারানসীর একটি অংশ—সরুরাস্তা ও ঘিঞ্জি বাড়ি লক্ষনীয়।

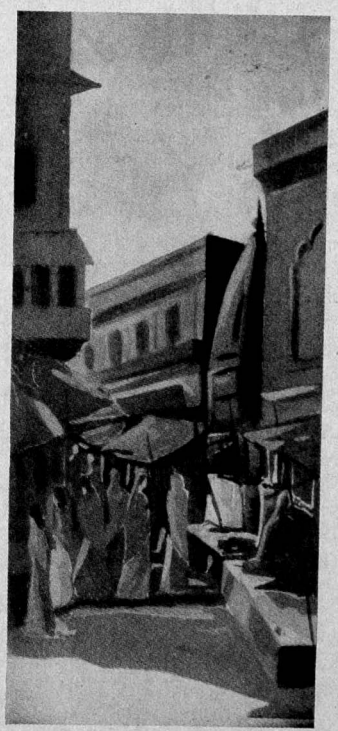

প্রায় নগণ্য বলা চলে। এই পৌনঃপুনিক বিদেশী আক্রমণের জন্যই উত্তর ভারতের অধিবাসীরা তাঁদের মহল্লাগুলিকে অত্যন্ত ঘেষাঘেষি বা ঘিঞ্জিও কোরতে বাধ্য হোয়েছিলেন। কোনো উত্তর ভারতীয় শহরে যখন বিদেশী আক্রমণ আসন্ন সে সময়কার একটি বর্ণনা দিলেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে। নিম্নোক্ত বর্ণনা যদিও কাল্পনিক তবু বলা যায় যে বোধ হয় সমসাময়িক অবস্থা অনেকটা এই ধরনেরছিল।

ধরা যাক একদল বিদেশী শত্রু শহরের ঠিক বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। এসব আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে সেকালে অধিকাংশ শহরই প্রাচীরবেষ্টিত ছিল; মাঝে মাঝে দরজা, ওপরে শান্ত্রীদের পাহারা দেবার ঘর। দিল্লী,লাহোর এসব জায়গায় এখনও এই ধরণের প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দেখা যাবে। কোনো শহরের বাইরে জলপুর্ণ পরিখা ছিল—যেমন বর্গীদের এড়ানোর জন্য ইংরেজরা কলকাতার চারদিকে পরিখা—'মারাঠা ডিচ্' খুঁড়েছিলেন। আমরা মেগাস্থেনিসের বিবরণ থেকে জানতে পারি যেসম-সাময়িক পাটলীপুত্রের চারদিকেও এরকম একটি পরিখা ছিল। এবার আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফেরা যাক। দেওয়ালের বাইরে শত্রুরা, এপারে ওপারে এবং ভিতরে শান্ত্রীরা। যুদ্ধ চললো। হয়ত কয়েকবার শত্রুরা হঠে গেল কিন্তু একদিন দেওয়াল অথবা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল। তখন নাগরিকেরা খুবই চিন্তিত হোলেন। শান্ত্রীরা হেরে যাওয়াতে জনসাধারণেরওপরেই শহর রক্ষার ভার পড়ল। তাঁরা বিভিন্ন পাড়ায় প্রতিরোধের দল তৈরী করলেন। সাধারণ লোকের হাতে কোনদিনই দা, বঁটি, সড়কী এসবের বেশি অস্ত্র থাকত না। অনেক লোকের তাও ছিল না। এদিকে দুর্ধর্ষ শত্রু এগিয়ে আসছে হত্যা ও লুঠনের জন্য। এই অবস্থায় এসব গলিঘুজির ঘিঞ্জি বাড়ীগুলি থাকতে লোকের খুব সুবিধা হোয়েছিল। গলিগুলি খুব সরু থাকায় একসঙ্গে বেশি শত্রু ঢুকতে পারত না এবং এগুলিও অনেকটা গোলক ধাঁধা ধরনের হওয়ায় শত্রুদলের অনভিজ্ঞ মানুষরা একেবারে নিঃশেষ হোয়ে যেত। সরু গলির মধ্যে শত্রুরা ঢুকলে তারা অবস্থাগতিকে এক জায়গায় কখনই সংখ্যায় বেশি হোতে পারত না; পাড়ার লোকেরা প্রথম চোটেই তাদের বেশ কিছু ঘায়েল কোরে দিতেন এবং যাঁরা তখনও বেঁচে থাকতেন পলায়মান সেই শত্রুদের ওপরে ঘিঞ্জি বাড়ীর ছাদ থেকে ফুটন্ত জল,বড় বড় পাথরের টুকরো অথবা ভারী বাক্স এসব ফেলা হোতো। এভাবে তারা নির্মূল হোয়ে যেত। এই গলি-ঘুঁজি ও ঘিঞ্জি বাড়ীর জন্যে শত্রুরা শহরে ঢুকে বিশেষ সুবিধে কোরতে পারত না। অনেক ঠেকে-শিখে এসব প্রাচীন শহরের অধিবাসীরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্যেই সরু গলি ও ঘিঞ্জির বাড়ীরব্যবস্থা কোরেছিলেন।

খবরাখবর

প্রেমেন্দ্র মিত্র ইউরোপ সফর কোরে ফিরে এসেছেন।

স্বনামধন্য কবি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সম্প্রতি বেলজিয়াম সফর কোরে এলেন। আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলনে অন্যান্য আরো দুজনের সঙ্গে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব কোরেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র সুন্দরম্-এর সম্মানীয় লেখক। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে তিনি সার্থক পথিকৃত। স্বীয় সৃজনশীল প্রতিভায় তিনি ইতোমধ্যেই বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন কোরেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিদেশ যাত্রা বস্তুবতঃ এই প্রথম।

—তাঁকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সেদিন মৌচাক' সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের জন্মোৎসবের খবর পেয়ে আরো অনেকের সঙ্গে সুন্দরম্ও তার আনন্দ জ্ঞাপনে উৎসাহিত। এই কাজটা, সুন্দরম্-এর মতে, অনেক আগেই করা উচিত ছিলো। কেননা, সে বিশ্বাস করে, সুধীরচন্দ্রকে সংবর্ধনা না জানানো কথা-শিল্পীদের একটি অবশ্য করণীয় কাজ।

সুধীরচন্দ্র সরকার, বাঙালী কথা-শিল্পীদের অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবে, একটি উজ্জ্বল এবং অবিস্মরণীয় নাম। সেই কারণে, কথা-শিল্পী মহলে তো বটেই জনসাধারণের

কাছেও অনস্বীকার্যভাবে তিনি শ্রদ্ধেয়।

আঠারোশো নিরানব্বই সালে, বহরমপুর শহরে তাঁর জন্ম। সাহিত্যপ্রীতি তাঁর সহজাত। এই সাহিত্যই, পুস্তক ব্যবসায়ের দিকে তাঁকে আকৃষ্ট করে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রভৃতি সাহিত্যিকদের সহায়তায় তিনি 'মৌচাক' নামে শিশুদের মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। শিশু সাহিত্যে এই পত্রিকাটি আজও একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার কোরে আছে।

তাঁর আর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি 'হিন্দুস্থান ইয়ার বুক' সম্পাদনা। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ছাত্র, অধ্যাপকদের কাছে এই বইটি যে কতখানি স্থান জুড়ে আছে তা বোলে শেষ করা যায় না। সম্প্রতি তিনি 'পৌরাণিক অভিধান' প্রণয়ন কোরে খ্যাতি অর্জন কোরেছেন।

কিছুদিন হোলো শ্রীসুধীর সরকার মহাশয়ের জন্মদিন সুসম্পন্ন হোয়ে গেলো।

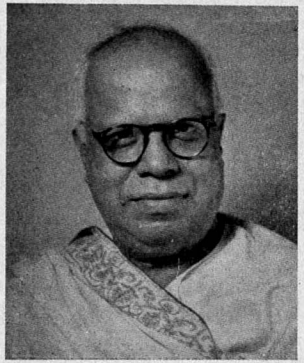

প্রখ্যাতনামা ভাস্কর দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরীর পুত্র ভাস্কর রায় চৌধুরী সম্প্রতি আমেরিকায় তাঁর দলবল সহ নৃত্য প্রদর্শন কোরে প্রভূত খ্যাতি অর্জন কোরেছেন। খবরে প্রকাশ, মার্কিন দর্শকদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হোয়েছেন।

আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসবে ভাস্কর যোগদান কোরেছিলেন। সুন্দরম্ তাঁর কৃতিত্বে আনন্দিত। তিনি উত্তোরোত্তর আরো প্রতিষ্ঠা অর্জন করুন।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ-কংগ্রেস কমিটি স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে গত কয়েক বছর যাবৎ শিল্পী, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, অভিনেতা প্রমুখ গুণিজনকে সংবর্ধনা জানিয়ে আসছেন। এবারে তাঁরা সজনীকান্ত দাস, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং দেবকী বসুকে সংবর্ধিত কোরেছেন।

প্রথম দিনে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—বনফুল, দ্বিতীয় দিনে শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা আসরে শ্রীযুক্ত পূর্ণ চক্রবর্তী, তৃতীয় দিনে শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা-সভায় শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্তী এবং চতুর্থ দিনে শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসুর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত মধু বসু সভাপতিত্ব করেন। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ছিলো, ঐ দিনের সভাপতি বনফুল কবিতায় শ্রীসজনীকান্ত দাসকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন কোরলে শ্রীযুক্ত দাসও তাঁর বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে স্বরচিত কবিতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিনের আসরে প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচক শ্রীঅর্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সংবর্ধনা আসরে শিল্পী শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের কর্মময় জীবনী আলোচনা কোরে তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। উত্তরে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় শিল্পী দৃষ্টিতে ভারতের বৈচিত্র্যময় জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্প-কলার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্মীর অভাবের কথা উল্লেখ করেন। তৃতীয় দিনের আসরে শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্তী শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা কোরে বলেন, তাঁর প্রতিভার জ্যোতি বাংলাদেশ অতিক্রম কোরে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পোড়েছে। তাঁর আশা এই যে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় সুস্থ হোয়ে পুনরায় তাঁর দেশবাসীকে আনন্দ দান কোরবেন। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ও উত্তরে তাঁর সেই আশা পোষণের কথা বোললেন। গুণীজন সংবর্ধনার শেষ দিনে প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক শ্রীদেবকীকুমার বসুকে সংবর্ধিত কোরে শ্রীমধু বসু চলচ্চিত্রজগতে তাঁর দীর্ঘ ৩২ বৎসরের অক্লান্ত সেবার উল্লেখ করেন। উত্তরে শ্রীদেবকীকুমার বসু সংবর্ধনাদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রের সার্থকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সুন্দরম্ সংবর্ধিত এই গুণিজনদের দীর্ঘায়ু কামনা কোরছে।

সুরের গুরু আলাউদ্দীন খাঁকে সম্প্রতি কোলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান নাগরিক সংবর্ধনা জানিয়েছেন। এজন্য পৌর-প্রতিষ্ঠান আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

শিল্পীর হাতে রৌপ্যাধারে রক্ষিত একটি ক্ষুদ্রায়তন বীণা উপহার ও মানপত্র অর্পণ করেন পৌর-পাল শ্রীবিজয় কুমার ব্যানার্জি। সংবর্ধনার উত্তরে আনন্দাবিষ্ট প্রধান সুর-সাধক অনাড়ম্বর ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তাঁর সংগীত জীবনের যে দুর্যোগপূর্ণ সূচনাপর্ব বর্ণনা করেন, তা উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক। বাংলাদেশের তথা ভারতীয় সংগীতের সজীব ঐতিহ্য সুর-গুরু আলাউদ্দীন খাঁর দীর্ঘায়ু কামনা কোরছে সুন্দরম্।

বহির্ভারতে বাংলার গর্ব শ্রীসত্যজিৎ রায়ের প্রতিটি সৃষ্টির সম্মানলাভ সম্পর্কে বাঙালীর প্রত্যাশা অনেক। সাম্প্রতিক এক খবরে প্রকাশ, সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'জলসাঘর' ছবিটি (তারাশঙ্করের ঐ নামীয় বিখ্যাত কাহিনীর চিত্ররূপ) মস্কোতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সংগীতের জন্য রৌপ্যপদক লাভ কোরেছে। স্বনামপ্রসিদ্ধ সুর-শিল্পী ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ এই ছবিটির সংগীত-পরিচালক।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইউরোপ সফর কোরে সত্যজিৎ রায় সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছোটগল্প 'নষ্টনীড়'-এর চলচ্চিত্রায়ণের প্রাথমিক কাজে তিনি বিশেষ ব্যস্ত। 'অপুর সংসার'-এর নায়ক শ্রীসৌমিত্র

। ভাস্কর রায় চৌধুরী এবং তাঁর দল আমেরিকায় নৃত্য প্রদর্শন কোরেছেন।

চট্টোপাধ্যায় নির্মীয়মান ছবিটিরও নায়ক নির্বাচিত হোয়েছেন।

লব্ধ প্রতিষ্ঠ কথা-শিল্পী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনোজ বসুর জন্মদিনের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হোয়ে গেলো। তারাশংকরবাবু, মনোজবাবু দুজনেই বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের দানে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ। স্বদেশবাসিগণ তাঁদের দুজনের এই শুভ জন্মদিন মারফৎ জীবনের আর এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ায় স্বভাবতই খুশি।

তারাশংকরবাবু, মনোজবাবু, দীর্ঘজীবন লাভ করুন এবং সৃজনশীল স্বাক্ষরে বাংলা সাহিত্যকে আরো গৌরবান্বিত কোরে তুলুন—সমবেত এই কামনার সঙ্গে সুন্দরম্‌ও যোগ দিচ্ছে।

'ক্যালকাটা কেমিকেল'-এর প্রতিষ্ঠান পত্রিকা তথা হাউস ম্যাগাজিন 'লিঙ্ক' সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে। রুচি-সম্রান্ত রঙিন মলাট, ঝর্‌ঝরে ছাপা এবং নিখুঁত সম্পাদনায় পত্রিকাটি অত্যন্ত লোভনীয় হোয়েছে। অন্যান্য ভারতীয় প্রতিষ্ঠান পত্র তো বটেই, যে কোনো বিদেশী হাউস ম্যাগাজিনের সঙ্গেও 'লিঙ্ক' একাসনে বোসতে পারে।

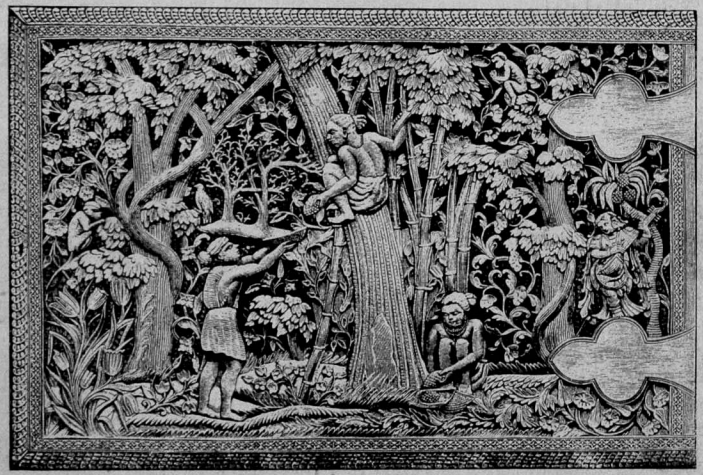

সেদিনের কথা মনে পড়ে?

জীবনটা যেন দেখতে দেখতেই কেটে গেল। মনে হয়—
এই তো কাল যখন নিশ্চিন্ত দু'টি তরুণ হৃদয় তাদের সংসার-জীবন সুরু করেছিল। আর আজ, ঘটনা-বহুল অতীতের দিকে পরিতৃপ্ত চোখ মেলে জীবন-সন্ধ্যার এই দিনগুলি পরম নিশ্চিন্তে কাটাবার ভরসাই তাঁরা পাচ্ছেন। কারণ, তাঁরা যৌবনে এক এজেন্টের পরামর্শ শুনে বুদ্ধিমানের মতো জীবন-বীমায় টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন এবং তারই ফলে একটা নির্দিষ্ট আয়ে তাঁদের অবসর জীবন আজ সুখী ও আরামপ্রদ।

আজই জীবন-বীমায় টাকা বিনিয়োগ করে নিজের ভবিষ্যতকে নির্বিঘ্ন করার ব্যবস্থা পাকা করুন।

লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া

LIC-6C BEN

সম্পাদক,প্রকাশক ও মুদ্রক : সুভো ঠাকুর। ১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কোলকাতা। মুদ্রণ : দি আর্ট সেন্টার প্রাঃ লিঃ, ৭ ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট,কোলকাতা

প্রাচীন কারুশিল্পের আকর্ষণ আজও সজীব

ধাতু, কাঠ, রুপা, কার্পাসতন্তু, শিং ও হাতির দাঁত দিয়ে ভারত সবসময়েই সুন্দর সুন্দর জিনিষ তৈরী করেছে। ৩টি ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরী তাঞ্জোরের ছোট থালা ও বাটি, উজ্জ্বল ও স্থায়ী রঙের নির্মল বাসন, কাগজেও মন্ডে তৈরী জিনিষপত্র, কাঠখোদাই, অলঙ্কার ও গালিচা এগুলি সব প্রাণবন্ত ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিচায়ক।

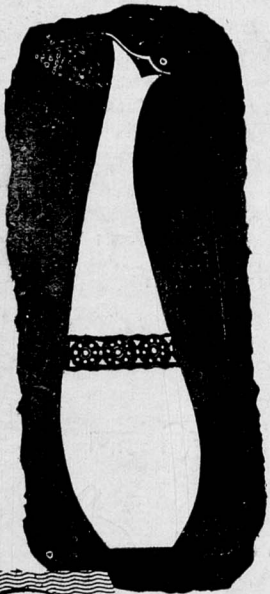

নিখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ড,

ভারত সরকারের

বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়।

DA58/451